৭.০৩ বনহুর ও নিশো – Bangla Library

৭.০৩ বনহুর ও নিশো – Bangla Library

বনহুর ও নিশো– ১০৩

বনহুর দেখলো বন্ধুত্ব আর বজায় রইলো না, এখন শকবল থেকে রক্ষার প্রয়োজন। ঐ নেশাযুক্ত তরল পদার্থ পান করলে সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতো এবং ঐ মুহর্তে জংলী সদর সবাইকে হত্যা করতো।

বনহুর উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই জংলী সর্দার নিশোর হাতখানা বলিষ্ঠ মুঠায় চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো।

নিশো চিৎকার করে উঠলো এবং হাত বাড়ালো বনহুরের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারলো বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, এখন চুপ করে থাকার সময় নয়, সে আক্রমণ করলো জংলী সর্দারকে।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

নিশোর পিতা তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিলো গুলী ছোঁড়ার জন্য।

গুলী চালালো নিশোর পিতা ও তার সঙ্গীরা।

বনহুর জংলী সর্দারকে আক্রমণ করায় জংলী সর্দার নিশোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

জংলী সর্দার আর বনহুর মঞ্চের উপরে লড়াই চলেছে।

নিশোর বাবা জংলী সর্দারকে তাক করে গুলী ছুঁড়তে যাচ্ছিলো কিন্তু নিশো তাকে নিষেধ করলো। কারণ হঠাৎ গুলী বনহুরের দেহে বিদ্ধ হতে পারে তাই নিশো পিতাকে হাত তুলে বারণ করে দিলো গুলী যেন না ছোড়।

দস্যু সর্দার যেমন শক্তিশালী, তেমনি অসুরের মত শক্তি রাখে জংলী সর্দার। উভয়ে উভয়কে পরাজিত করার চললো প্রচন্ড চেষ্টা।

নিশো বনহুরকে মঞ্চের উপর একা রেখে নেমে আসতে রাজি নয়। তাই সে একপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো সবকিছু।

জংলী সর্দার উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ওর নাকে বসিয়ে দিলো এক ঘুষি। অমনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো জংলী সর্দার নিচে, একেবারে কাঠের মঞ্চ থেকে নিচে মাটিতে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিশোর পিতা জংলী সর্দারকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো।

বিকট এক চিৎকার করে জংলী সর্দার উঠে দাঁড়াতে গেলো কিন্তু পারলো না পড়ে গেলো। মাটির মধ্যে মুখ গুঁজে।

রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো শুকনো মাটি।

আশ্চর্য জংলীদল–সর্দারের অবস্থা দেখে কে কোথায় উবে গেলো তার ঠিক রইলো না। একদন্ডের মধ্যে সবাই যেন হাওয়ায় অন্তর্ধান হলো।

বনহুর নেমে এলো মঞ্চটার উপর থেকে।

তার মুখমন্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। জংলী সর্দার নিহত হওয়ায় তার দলবল সবাই লুকিয়ে পড়লো গভীর জংগলে, আর তারা আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো না।

বনহুর নিশোর পিতা ও সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ফিরে এলো ষ্টিমারে।

ইংগিতে বনহুর নিশোর পিতাকে জানালো এখানে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি ষ্টিমার ঐস্থান ত্যাগ করবার জন্য জানালো সে।

নিশো আর তার পিতা বনহুরের ইংগিতপূর্ণ কথা বুঝতে পারলো। তারা আর বিলম্ব না করে ষ্টিমার ছাড়লো।

নিশো এসে হাত রাখলো বনহুরের কাঁধে।

চোখেমুখে তার আনন্দেদাস।

জংলী সর্দার তাদের নিয়ে গিয়ে কি ভাবে আক্রমণ চালিয়ে নিশোকে নিজের আয়ত্তে আনতে চেয়েছিলো, ভাগ্যিস বনহুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়–নইলে নিশোকে হারাতে হতো।

নিশোর পিতাও কন্যাকে উদ্ধার করতে পেরে খুব খুশি হলো।

আবার হলো যাত্রা শুরু।

ষ্টিমারখানা ভেসে চলেছে।

দিন দিন খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে আসছে।

নিশো আজকাল একটু সময় পেলেই এসে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

নিঃসঙ্গ মুহূর্তে নিশোর সঙ্গ বনহুরের মন্দ লাগে না।

বনহুর ওকে দুচারটা ইংরেজি ভাষা শিখিয়েছে।

নিশোর কাছ থেকে বনহুরও তাদের ভাষায় কথা বলা শিখে নেবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে কিছু শিখেও নিয়েছে সে। তাই নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো আজকাল ভালই লাগে বনহুরের।

সেদিন বনহুর ক্যাবিনে বসে তাকিয়ে ছিলো সীমাহীন জলরাশির দিকে। নানা কথার উদ্ভত হচ্ছিলো মনে। তার জীবনে বহু ঘটনা ঘটেছে যা তার মনকে বিচলিত করে তোলে নিজের অজান্তে।

বনহুর ভাবছিলো আস্তানার কথা।

এমন সময় মনের আকাশে ভেসে উঠে একটা মুখ–জংলীরাণীর কথা। সরল সহজ একটি সুন্দর মুখ, দুটি দীপ্তিময় চোখ। একদিন বনহুর ওকে ভালবেসে ছিলো, ওর চোখ দুটো তাকে আকর্ষণ করেছিলো। বনহুরকে জংলীরাণী ডাকতত বাবুজি বলে, ঐ ডাকটাও জংলীরাণী শিখেছিলো বনহুরের কাছে।

অনেক কথাই শিখেছিলো জংলীরাণী কিন্তু কোথায় যে সে হারিয়ে গেছে বনহুর আজও জানে না।

বনহুরকে ভালবেসেছিলো জংলীরাণী।

তার ভালবাসা ছিলো পবিত্র।

তাই আজও বনহুর ভুলতে পারেনি তাকে। ওর সুন্দর ফুলের মত মুখখানা বারবার মনে পড়ছে। না জানি কোথায় হারিয়ে গেছে সে কোন অন্ধকারে অতলে।

বনহুর জানে না চোরাবালি তাকে গ্রাস করেছে। তার সেই দিনের আর্তচিৎকার আজও সেখানের বাতাসে আর্তনাদ করে ফিরছে। বনহুর এসব জানে না, জানলে হয়তো ভীষণ একটা কান্ড ঘটে যেতো সেদিন।

গভীরভাবে ভাবছিলো বনহুর অনেক কথা এমন সময় কেউ এসে বসলো তার পাশে।

বনহুর চমকে উঠলো।

মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বললো নিশো-বাবুজী।

এই শব্দটা নিশো বনহুরের কাছেই শিখেছে, আর দুএকটা শিখেছে নিশো– আমি ভাল, তুমি ভাল, আকাশ নীল, সমুদ্রের পানি নীল–এমনি কয়েকটা কথা।

নিশো যখন বাবুজী বলে ডাকে তখন বনহুরের কানে জংলীরাণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, যখন সে হাসে তখন তার চোখের সম্মুখে ভাসে সেই মুখখানা, কারণ নিশোর আচরণে জংলীরাণীর ছায়াপাত ঘটে।

নিশো অনেককিছু বলতে চায় বনহুরকে কিন্তু বলতে পারে না, কারণ তার কথা বনহুর বোঝে না। বনহুরেরও তাই, অনেক কথা জমা হয়ে উঠেছে তার মনে। নিশোর কাছে অনেক কথা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না।

এটা সত্যিই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা।

যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

নিশোকে শিখিয়ে পড়িয়ে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে বনহুর। একটু আধটু বোঝাতে পারেনি যে তা নয়। নিশো নিজেও বনহুরকে কিছু কিছু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর বললো—নিশো?

নিশো মাথার চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বললো–বাবুজীবুজী তুই–আংগুল দিয়ে বাইরে দেখিয়ে বললো–চল।

বনহুর বললো–বাইরে কি আছে?

এবার নিশো কি বললো তার এক বর্ণও বুঝতে পারলো না। বললো– চলো।

নিশো বনহুরের হাত ধরে টেনে বের করে আনলো ডেকের উপরে, তারপর আংগুল দিয়ে দূরে লক্ষ্য করে বললো–শিয়াকো দিমা নিকো…শিয়াকো…

বনহুর বুঝলো এবার দূরে তীর দেখা যাচ্ছে তাই নিশো খুশি হয়েছে।

এমন সময় নিশোর বাবাও এলো সেখানে। তার হাতে বাইনোকুলার। চোখে লাগিয়ে বললো–বাবুজী পিকাকো মোর মোর দিয়া নিকো....

বনহুর বুঝলো তারা বলছে তীর দেখা যাচ্ছে, এবার আমরা ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো।

বনহুর নিশোর বাবার হাত থেকে বাইনোকুলার নিয়ে দেখলো। তীর দেখা যাচ্ছে–দূরে বহুদূরে একটা রেখার মত মনে হচ্ছে।

যাক একটা পথ পাওয়া গেলো।

এত তাড়াতাড়ি তীরের সন্ধান পাওয়া যাবে ভাবতে পারেনি বনহুর।

নিশো বনহুরের হাতখানা ধরে খুশিতে হাতের পিঠে চুমু দিলো, তারপর উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়লো যেন।

বনহুর হাসতে লাগলো।

ষ্টিমারখানা এক সময় এসে পড়লো তীরের কাছাকাছি।

এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটা বন্দর বলে মনে হচ্ছে, লোকজন চলাফেরা করছে। যানবাহনও নজরে পড়ছে বন্দরের নিকটতম রাস্তায়।

বনহুরের মনেও একটা আশার আলো উঁকি দিয়ে গেলো, যাক এবার তাহলে লোকালয়ের সন্ধান পেলো তারা।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো তীরস্থ বন্দরটা।

লোকজন এবং যানবাহন স্পষ্টভাবে নজরে আসছে।

বন্দরে কাজ হচ্ছে।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেকের উপরে।

*

বন্দর।

নাফসা বন্দর।

বেশ কয়েকখানা জাহাজ নোঙ্গর করে আছে বন্দরে।

বনহুর লক্ষ করলো নোঙ্গর করা জাহাজগুলোর মধ্যে একটা জাহাজ বেশ দূরে এবং নতুন ধরনের। জাহাজখানার তেমন কোনো জানালা নেই। কেমন যেন বিস্ময় জাগলো বনহুরের মনে।

এক সময় বন্দরে তাদের ষ্টিমারখানা নোঙ্গর করলো।

বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলো নিশো।

আনন্দে চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠছে তার।

নিশোর পিতা এবং অন্য যারা তাদের চোখেও খুশির উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে।

বনহুর সঙ্গীদের নিয়ে ষ্টিমার থেকে নেমে পড়লো।

বন্দরে অবতরণের পর বনহুর বুঝতে পারলো এটা নতুন এক দেশ। দেশের নাম কি তা বনহুর জানে না তবে বন্দরের নামটা বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে লেখা আছে–নাসফা বন্দর। তার নিচে দেশীয় ভাষায় লিখা বন্দরের নামটা।

বনহুর বুঝতে পারলো এদেশের মানুষ কিছু না কিছু ইংরেজি জানে।

কতকটা নিশ্চিন্ত হলো বনহুর।

বন্দরটাও বেশ নতুন ধরনের লোকজনের সংখ্যা অন্যান্য দেশের চেয়ে কম নয়। সবাই কর্মব্যস্ত।

বনহুর আর নিশো এগিয়ে চলেছে।

পিছনে নিশোর বাবা আর অন্যান্য কয়েকজন।

একজন ষ্টিমারে রইলো।

ষ্টিমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তাকে রাখা হলো ষ্টিমারে।

বন্দরের অনতিদূরে একটা সরাইখানা।

বনহুর নিশোকে ইংগিতে বললো–চলো কিছু খাওয়া যাক, সন্ধ্যার বেশি বিলম্ব নেই।

নিশো কথা না বুঝলেও ইংগিত বুঝলো।

নিশো তার পিতাকে বললো–আগুলা নুয়া মুশামাই...কথা কয়টি উচ্চারণ করার সঙ্গে নিশোর কথায় খুশির আভাস ঝরে পড়ছিলো। নিশোর বাবাও নিশোকে বললো–রাসুমা নিমা ওয়া মাইদিলাম।

তারপর সবাই মিলে সরাইখানার দরজায় এসে দাঁড়ালো।

সরাইখানার দরজার মুখে দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো তারা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ভাষায় অভ্যর্থনা জানালো বনহুর ও তার দলবলকে। বনহুর সঙ্গীদের সহ প্রবেশ করলো সরাইখানার মধ্যে। আশ্চর্য ধরনের সরাইখানা, টেবিলে নানা ধরনের খাবার সাজানো আছে, খাবারের পাশে প্লেট এবং কাটা–চামচ রয়েছে। প্রতিটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা তরুণী।

তাদের দেহে অদ্ভুত ধরনের পোশাক।

একটি অর্ধ ছাট খাগড়া।

মাথায় চুল ঝাকড়া, কানে বালা।

ছোট জামা।

আঁটসাট পোশাক বলা যায়।

প্রত্যেকটা তরুণীর চেহারা কতকটা একই রকম। সবাই হাতে এক একটা কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর নিশোর দিকে তাকালো।

নিশো কিছু বললো, বনহুর মোটেই বুঝতে পারলো না। সে নিশোকে নিয়ে একটা টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

যে তরুণী টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সে এগিয়ে এসে কার্ড হাতে দিলো বনহুরের।

বনহুর কার্ডে দৃষ্টি বুলাতেই বুঝতে পারলো এখানে যে খাবার সাজানো রয়েছে তার মূল্যতালিকা। খুশি হলো বনহুর, সে টেবিলে বসে পড়লো এবং সঙ্গীদের টেবিলে বসার জন্য ইংগিত করলো।

সবাই মিলে খেলো ওরা।

তারপর বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই নিশোর পিতা বিল পরিশোধ করে দিলো।

কতদিন পর পরিতৃপ্তভাবে খেলো বনহুর।

খাওয়া শেষ করে যেমনি ওরা সরাইখানা থেকে বের হতে যাবে সেই মুহূর্তে বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো একজন তরুণী, বললো সে– আপনারা আজ এখানে থাকবেন, কারণ এ সরাইখানায় যারা আসেন তারা রাত্রি যাপন না করে যেতে পারেন না।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথাগুলো বললো তরুণী।

বনহুর জবাব দিলো–কাজ আছে তাই রাত্রি যাপন করা সম্ভব নয়।

তরুণী বললো–নিয়মের ব্যতিক্রম হবার যো নেই, কাজেই বুঝতেই পারছেন।

বনহুর অগত্যা দলবলসহ সেই সরাইখানায় রাত্রি যাপন করবে বলে আশ্বাস দিলো তরুণীকে।

তরুণী খুশি হলো।

বনহুর ও তার দলবলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো তরুণী।

নতুন দেশ।

সবকিছু নতুন বলে মনে হচ্ছে।

সরাইখানার একটি বড় ক্যাবিনে সবাইকে নিয়ে গেলো তরুণী।

কক্ষ বা ক্যাবিনটা পছন্দ হলো।

বনহুর নিশোর বাবার দিকে তাকিয়ে বললো–এখানে রাত্রি কাটাতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ইংগিতেও সে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো।

নিশোর বাবা বুঝতে পারলো এবং সে রাত্রি যাপন করবার জন্য প্রস্তুতি নিলো।

নিশো আলাদা ক্যাবিনে এবং বনহুর আলাদা ক্যাবিনে ও অন্যান্য সকলে অন্য একটা ক্যাবিনে শয়ন করলো।

রাত্রি গভীর।

বনহুর শয্যা গ্রহণ করলেও ঘুমিয়ে পড়লো না। সজাগভাবে চক্ষুদ্বয় বুজে শুয়ে রইলো। কান তার সজাগ রয়েছে।

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছিলো।

হঠাৎ আলোটা লালচে হয়ে উঠলো।

বনহুর চোখ মেলে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে দেখলো তার শয্যার পাশে একটা। দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট লম্বাদেহী কোনো ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিটার চোখমুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে বনহুর। ওর চোখ দুটো লালচে আলোতে জ্বলছে যেন।

নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলো বনহুর।

এমন সময় শিয়রে নারী কণ্ঠস্বর– এই ব্যক্তিটাকেই খুঁজছে তারা সাবধানে বেঁধে ফেলো ইয়ংল।

বনহুর বুঝতে পারলো এখানে সে নতুন হলেও তার পরিচয় এরা যেমন করে হোক পেয়ে গেছে। কিন্তু বেশি ভাবার সময় নেই বনহুরের। নিশোর বাবা ও নিশো এবং তাদের দলবলের কথাও ভাবার সময় নেই। এই বিরাট আকার ব্যক্তি এই মুহূর্তে তাকে বেঁধে ফেলবে, তার পূর্বেই তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

বিরাটদেহী ব্যক্তি তার দিকে ঝুঁকে পড়তেই বনহুর প্রচন্ড এক লাথি মারলো লোকটার তলপেটে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চীৎ হয়ে পড়ে গেলো।

কারণ লোকটা বুঝতেই পারেনি যাকে সে বাধতে যাচ্ছে সে ঘুমন্ত নেই জেগে আছে।

সেই দন্ডেই বনহুর শয্যা ত্যাগ করে আক্রমণ করলো বিরাটদেহী লোকটাকে।

ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হলো। দীর্ঘদেহী লোকটাকে বনহুর ফেলে দিলো মেঝেতে, তারপর চেপে ধরলো ওর গলা।

গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হলো দীর্ঘদেহী লোকটার কণ্ঠ থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ পেছন থেকে বনহুরের মাথায় প্রচন্ড আঘাত করলো লোহার রড নিয়ে।

ভয়ংকর আঘাতটা বনহুর সহ্য করতে পারলো না, পড়ে গেলো দীর্ঘদেহী লোকটার পাশে।

দীর্ঘদেহী লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

তরুণী তাকে ইংগিত করলো সংজ্ঞাহারা বনহুরকে কাঁধে তুলে নিতে।

তরুণীর নির্দেশ পালন করলো দীর্ঘদেহী।

বনহুরের সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে তুলে নিলো সে। তরুণী দেয়ালে একটা বোতাম টিপলো, অমনি মেঝের কিছু অংশ সহ দীর্ঘদেহী নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলো।

নিশো কিন্তু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখলো।

অপর ক্যাবিনে বনহুর শয়ন করলেও নিশো বেশ সতর্ক ছিলো। ভাবছিলো হঠাৎ যেন কেউ তার ক্যাবিনে প্রবেশ না করে। নিশো তরুণী, তার নিজের প্রতি সজাগ থাকতো সে সর্বক্ষণ। সে জানে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান নয়। বেশ কিছু দিন আগে এমনি এক হোটেলে তার বাবার সঙ্গে সে রাত্রি যাপন করেছিলো। সেদিন সে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ঘুমাচ্ছিলো, পাশের শয্যায় ঘুমিয়ে ছিলো তার বাবা। রাত গভীর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাবিনের দরজা খুলে প্রবেশ করলো এক ব্যক্তি।

নিশোর বুকটা সেদিন ধক করে উঠেছিলো। রুদ্ধ নিশ্বাসে সে প্রতীক্ষা করছিলো। লোকটা ঠিক তার শয্যার পাশে এসে তাকে আক্রমণ করলো।

নিশো আর্তনাদ করে উঠেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিশোর পিতার ঘুম ছুটে গিয়েছিলো। সে আক্রমণ করেছিলো প্রচন্ডভাবে। মনে আছে নিশোর সেই দিনের ভয়ংকার অবস্থার কথা।

ভাবতেও গা শিউরে উঠে নিশোর।

ঐ দিন কোনোক্রমে রক্ষা পেয়েছিলো বাপ ও মেয়ে। ছোটলের মালিক এসে পড়ায় কর্মচারীটা নিশোকে স্পর্শ করতে পারেনি।

আজও হোটেলে শুয়ে সজাগ ছিলো নিশো, কান দুটোকে সে খাড়া করে রেখেছিলো ভালভাবে।

হঠাৎ কানে আসে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ।

নিশো সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় এবং চলে আসে আলগোছে পাশের ক্যাবিনে। এবং নিজের চোখে সব লক্ষ্য করে ভালভাবে।

দীর্ঘদেহী যখন বনহুরকে নিয়ে অদৃশ্য হলো তখন তরুণী বেরিয়ে গেলো অপর দরজা দিয়ে।

তরুণীটি বেরিয়ে যেতেই নিশো সেই স্থানে এসে দাঁড়ালো। যে বোতাম টিপে ছিলো তরুণী ঠিক তার পাশের সুইচ টিপলো সে। অমনি তার সম্মুখে একটা

সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।

নিশো বিলম্ব না করে সেই পথে নেমে চললো নিচে।

সোজা সুড়ঙ্গপথ।

বিস্ময়কর।

নিশো যতই নিচে নামছে ততই একটা শব্দ তার কানে ভেসে আসছে। আশ্চর্য লাগছে নিশোর তেমনি বিপুল আগ্রহ জাগছে মনে। বনহুরকে নিশো ভালবেসে ফেলেছে, সে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করবে তাকে।

বিরাটদেহী লোকটা বনহুরকে নিয়ে কোথায় উধাও হলো কে জানে।

নিশো সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নেমে এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলো যেখানে জমাট অন্ধকার, কোনো পথ সে আর দেখতে পাচ্ছে না।

চোখ রগড়ে তাকালো নিশো।

দেখলো ধীরে ধীরে অন্ধকার কমে আসছে।

আলোর ক্ষীণ রশ্মি নজরে পড়লো।

একটা টেবিল।

টেবিলে শায়িত এক ব্যক্তি।

নিশো ভালভাবে লক্ষ্য করতেই শিউরে উঠলো টেবিলে শায়িত ব্যক্তিই তার প্রিয়জন।

বনহুরকে বিরাটদেহী কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসে যে ঐ টেবিলে শুইয়ে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

টেবিলের পাশে একজন দাঁড়িয়ে।

নিশো তার মুখ ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না।

তবু সে ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো।

এমন সময় সেই অদ্ভুত শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দেখলো জমকালো একটা মেশিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা খাড়া দেয়ালের মত।

যে লোকটা এতক্ষণ টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সে দ্রুত সরে গেলো একপাশে।

দেয়ালের মত যন্ত্র বা মেশিনটা আরও এগিয়ে আসছে।

এবার তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠলো।

চোখ ধাধিয়ে গেলো নিশোর।

বনহুর তখনও সংজ্ঞাহীন।

তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবার।

নিশোর ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে সে ওকে আগলে ধরে। কিন্তু নিরুপায়, তাকে দেখলেই ওরা ধরে বন্দী করবে তখন পারবেনা আর কিছু করতে।

নিশো ঠিক বুঝতে পারছে না দেয়ালটা কি করে এগিয়ে আসছে। শুধু শব্দ হচ্ছে কড় কড় কছু অদ্ভুত শব্দ।

নিশো বুঝতে পারলো ঐ দেয়ালটা এসে সংজ্ঞাহীন বনহুরের দেহটা নিঃশেষ করে ফেলবে। দেয়ালের তলদেশটা ঠিক রোলারের মতো।

তবে কি ওকে থেতলে ফেলা হবে।

নিশোর চোখ দুটো ভয়ে আতঙ্কে ছানাবড়া হলো। সে ভালভাবে লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলো ওপাশে একটা লোক একটা হ্যান্ডেল যোরাচ্ছে। আর রোলারের মত কঠিন দেয়ালটা সরে আসছে আস্তে আস্তে।

নিশো তাকিয়ে দেখলো আর একদন্ড বিলম্ব করলে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে ওর দেহটা। ওকে যেমন করে থোক রক্ষা করতেই হবে। নিশো কালবিলম্ব না করে

আড়ালে আত্মগোপন করে ছুটে গেলো এবং পেছন থেকে লোকটার গলা টিপে ধরলো।

নিশো নারী হলেও তার হাত দুখানা ছিলো অত্যন্ত শক্ত কঠিন। সাড়াশির মত লোকটার গলা চেপে ধরতেই সে গোঁ গোঁ করে উঠলো এবং হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে আক্রমণ করলো নিশোকে।

লোকটার গায়ে ছিলো ভীষণ শক্তি।

নিশোও কম নয়।

দুজনে চলছে মল্লযুদ্ধ।

রোলারসহ দেয়ালটা মাঝামাঝি এসে গেলো।

নিশো আর লোকটা উঠছে আবার পড়ছে কেউ যেন কম নয়। লোকটার চোখেমুখে তীব্রভাবে ঘুষি বসিয়ে দিচ্ছে নিশো। লোকটা একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

আসলে লোকটা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে প্রভুর নির্দেশমত কাজ করেছিলো। আজ নতুন নয় সে প্রায়ই এ কাজ করে থাকে। প্রতিদিন একটি দুটি তিনটি লোককে সে প্রভুর আদেশে নিষ্পেষিত করে থাকে। এ কাজ তার দৈনন্দিন ব্যাপার। শুধু জীবন্ত মানুষকে নিষ্পেষিত করে হত্যা করাই তার কাজ নয়, জীবন্ত থেতলে ফেলার সময় তার দেহের রক্তগুলো জমায়েত হয় টেবিলের নিচে একটি কাঁচপাত্রে।

ঐ রক্ত সংশোধিত হবার পর বিদেশে চালান যায় ব্লাড ব্যাংকে বা ব্লাড বাক্সে করে।

নিশো প্রাণপণে লোকটাকে কাবু করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সহজ নয় তাকে কাবু করা, একবার নিশো লোকটার চোখের মধ্যে আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিলো।

যন্ত্রণায় লোকটা চিৎকার করে উঠলো।

নিশো ওর চোখ থেকে যেমন আংগুল টেনে বের করে নিয়েছে অমনি হু হু করে রক্ত বেরিয়ে এলো লোকটার চোখ দুটো থেকে।

ঠিক ঐ মুহর্তে বনহুর নড়ে উঠলো।

সংজ্ঞা ফিরে এসেছে বনহুরের।

সে নিজকে শায়িত দেখলো একটা টেবিলে।

কিছু বুঝতে না পেরে তাকালো এদিক ওদিক।

দেখলো বনহুর নিশো আর একটি লোক ধস্তাধস্তি চলছে।

লোকটার চোখ দিয়ে হু হু করে রক্ত ঝরছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ছুটে এলো সে নিশোর পাশে।

নিশো আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে। একটা আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো সে।

ততক্ষণে অন্ধ লোকটাও হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে এগিয়ে এলো এবং ভীষণভাবে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলো বনহুর আর নিশোকে।

বনহুর দক্ষিণ হাতে নিশোকে ধরে রেখে বাম হাতে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো লোকটার নাকে।

লোকটা নিশোর আংগুলের খোঁচায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কাজেই চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। এমন একটা প্রচন্ড ঘুষি সহ্য করার মত শক্তি বা ক্ষমতা তার ছিলো না। পড়ে গেলো সে হুমড়ি খেয়ে।

নিশো ইংগিতে দেখালো একটু পূর্বে ঐ দেয়ালসহ রোলারটা নিষ্পেষিত করতে তার দেহটা।

বনহুর বুঝতে পারলো নিশো তাকে এই সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। অন্ধ লোকটা মেঝেতে চিৎপাত হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বনহুর ততক্ষণে নিশোসহ

দ্রুত সরে গেলো আড়ালে।

কারণ দুজন লোক এগিয়ে আসছে।

তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো বনহুর আর নিশো।

একজন তরুণী অপরজন পুরুষ।

এসেই বিস্ময়করভাবে বলে উঠলো তরুণী– একি লোকটা গেলো কোথায়...

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ লোকটার দিকে নজর পড়লো।

লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

তরুণী এবং লোকটা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো লোকটাকে তার চক্ষুদ্বয় দিয়ে হু হু করে রক্ত ঝরছে।

তরুণী বললো–বন্দীটাকে কেউ সরিয়ে নিয়েছে, নাহলে গেলো কোথায়?

অপর লোকটা বললো–হা, আমার তাই মনে হচ্ছে।

অন্ধ লোকটা আর্তকণ্ঠে বললো–আমাকে একটা মহিলা আক্রমণ করে এ অবস্থা করেছে। বন্দীকেও সে উদ্ধার করে নিয়ে সরে পড়েছে...আমার দুটো চোখ মহিলা আংগুল দিয়ে উপড়িয়ে নিয়েছে হায় হায়, আমি আর বাঁচবো না...

লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো।

তরুণী এবং তার সঙ্গীরা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করার সময় নেই। তারা শত্রুর সন্ধানে এগিয়ে চললো।

তরুণীর কণ্ঠস্বর বনহুর শুনতে পেলো, তরুণী বলছে–লোকটাকে ওরা খুঁজছিলো। তাদের হাতে তুলে দিলেও আমরা মোটা অংক পেতাম কিন্তু সর্দারের নির্দেশ তার রক্ত নাকি বেশি অর্থ এনে দেবো....

কথা শেষ না করেই তরুণী দ্রুত পা চালালো।

লোকটা তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর নিশোর হাত চেপে ধরে বললো–আর একদন্ড এখানে বিলম্ব করা যাবে না। চলো নিশো সরে পড়া যাক।

নিশো একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, বনহুর ঠিক বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝলো আর এখানে দেরী করা চলবে না। সে বনহুরের হাত মুঠায় চেপে ধরে অগ্রসর হলো।

বনহুর নিশোর কানে মুখ নিয়ে বললো–এ যাত্রা তোমার জন্য বেঁচে গেলাম নিশো, তোমাকে ধন্যবাদ।

নিশো কোনো জবাব দিলো না, কারণ সে বনহুরের কথার মানে বুঝতে পারলো না। তাই সে নীরবে এগুতে লাগলো।

কিছুটা এগুতেই সম্মুখে একটা ঘোড়ালো সিঁড়ি নজরে পড়লো। বনহুর নিশোর হাত ধরে সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। ঠিক ঐ দন্ডে সিঁড়ির পাদমূলে এসে ভোলো দুজন লোক। তারা মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই তারা সন্ধান করছে বনহুর আর নিশোর।

একটু বিলম্ব হলেই বনহুর আর নিশো তাদের শিকার হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো বটে কিন্তু সম্মুখে বিরাট এক বিপদ ওৎ পেতে ছিলো, সে হলো একটা ক্যামেরা। ক্যামেরাটা অটোমেটিক কাজ করে চলেছে।

বনহুরের এ ক্যামেরাটা অতি পরিচিত।

সে বেশ বুঝতে পারলো ক্যামেরায় তাদের ছবি ধরা পড়ে গেছে, আর পালাবার উপায় নেই।

বনহুর আর নিশো যেমনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাবে অমনি সিঁড়ির মুখে মারাত্মক অস্ত্র হাতে চারজন লোক এসে ঘেরাও করে দাঁড়ালো।

বনহুর তখন নিশোসহ সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে পড়েছে। উপরের দিকে তাকালে সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে চারজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি।

বনহুর অবাক হলো।

অজানা অচেনা দেশ সেখানেও বিপদ ওৎ পেতেছিলো তার জন্য। কিন্তু এ মুহূর্তে এসব ভাববার সময় নেই, নিচে শত্রু উপরে শত্রু।

বনহুর একটু ভেবে নিয়ে নিশোসহ নিচে নামতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে।

নিচে নামতেই তাকে আর নিশোকে ঘেরাও করে ফেললো একদল লোক, সবার হাতেই অস্ত্র।

বনহুর হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে শত্রুগণ হাতকড়া পরাতে গেলো।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে একজনের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে দিলো। এত দ্রুত সে হাত চালালো যে কেউ নিজ অস্ত্র ব্যবহার করবার সুযোগ পেলো না। গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

দুচারজন ছুটে পালালো।

আর দুতিনজন অস্ত্র চালিয়ে বনহুরকে কাবু করার চেষ্টা করলো।

অস্ত্রের খেলা চললো।

বনহুর নিশোকে নিজ হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে সে নিজে একটা নিহত ব্যক্তির অস্ত্র তুলে নিলো এবং সেই অস্ত্র ব্যবহার করে চললো।

বনহুরের অস্ত্রের মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না শত্রুপক্ষ। ফাঁকা হয়ে পড়লো জায়গাটা।

নিশোও নিশ্চুপ ছিলো না সেও অস্ত্র চালিয়ে চলেছে।

নিশো অত্যন্ত সতর্ক, বুদ্ধিমতী কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না শত্রু পক্ষকে কাবু করতে। ওরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হলো।

বনহুর নিশোকে নিয়ে এগিয়ে চললো।

কিন্তু বেশি দুর যেতে পারলো না, একটা বেষ্টনী জাল তাদের দুজনকে ঘিরে ফেললো। শক্ত মজবুত লৌহের বেষ্টনী। বনহুর নিশোর দিকে তাকিয়ে দেখলো সে তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

বনহুর বেষ্টনীর শিক ধরে খুব জোরে নাড়া দিলো।

একচুলও নড়লো না শিকটা।

এবার বুঝতে বাকি রইলো না বনহুরের, সে আটক শুধু নয় একেবারে যাকে বলে বন্দী। বনহুর আর নিশোর অবস্থা খাঁচায় আটক সিংহ আর সিংহীর মত।

দুজন লোক, তাদের হাতের আগ্নেয়অস্ত্র উদ্যত করে এগিয়ে আসছে। চোখ দিয়ে যেন আগুন। ঠিকরে বের হচ্ছে তাদের।

অস্ত্র উদ্যত করে ধরে বললো একজন তোমাদের হাতের অস্ত্র শিকের ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেলে দাও।

বনহুর নিশোর দিকে তাকিয়ে নিজ হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলো শিকের বাইরে।

এবার ওরা অস্ত্র নামিয়ে নিলো এবং এগিয়ে এসে বন্দীখাঁচার দরজা খুলে দিলো।

বেরিয়ে এলো বনহুর আর নিশো।

সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ বনহুরকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

নিশোর চোখ দুটে জ্বলে উঠলো ক্রুদ্ধ সিংহীর মত।

বনহুরকে ওরা বেঁধে নিয়ে চললো।

নিশো তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো কিন্তু ওরা পথ আগলে দাঁড়ালো।

যারা বনহুরের হাত দুখানাকে পিছমোড়া করে বেঁধেছিলো তারাই বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে গেলো। আর যারা অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা নিশোর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়লো।

নিশো দাঁতে অধর দংশন করতে লাগলো।

তার মনের মধ্যে একটা হিংস্রভাব নাড়া দিয়ে উঠছিলো ভীষণভাবে। কিন্তু নিরুপায়, তাই সে নীরব রইলো।

*

বনহুরকে নিয়ে ওরা সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চলেছে।

কোথায় চলেছে জানে না বনহুর।

তার হাত দুখানা মজবুত করে বাঁধা থাকায় সে বন্দী সিংহের মত অসহায় অবস্থায় এগুচ্ছিলো।

যারা তাকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে তারা নিজেরা অশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় কথা বলছিলো। বনহুর তাই ওদের কথাবার্তা বেশ বুঝতে পারছিলো।

কথাবার্তা থামছে না ওদের।

বললো একজন–এমন সুযোগ আমাদের ভাগ্যে আসবে ভাবতেও পারিনি।

অপর ব্যক্তি বললো–বহুদিন ধরে আমরা এর নাম শুনে এসেছিলাম। এর মূল্য দুলাখ টাকা থেকে দুকোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি একে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি তাহলে আর কোনোদিন ভাবতে হবে না। জিন্দেগীভর বসে বসে খেতে পারবো।

প্রথম ব্যক্তি বললো–দুকোটি টাকা যদি শুধু আমরা পেতাম তাহলে বড় একটা কিছু হতো। জানিস দুকোটির মধ্যে বেশিকিছু আসবে না কারণ অর্ধেক যাবে মালিকের তহবিলে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো–তাছাড়া কোনো উপায় নেই। একে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমরা যে অর্থ পাবে তার মধ্যেও আবার কিছু ভাগ হবে, শুধু আমাদের লাভ থাকবে মেয়েটা।

বনহুর বুঝতে পারলো নিশোর কথা বলছে।

এ মুহূর্তে তার হাত দুখানা যদি পিছমোড়া অবস্থায় বাধা না থাকতো তাহলে সে ওদের গলা টিপে হত্যা করতো, কারণ বনহুর সব সহ্য করতে পারে কিন্তু কোনো নারীর অবমাননা সে সহ্য করতে পারে না।

ওরা যে নিশোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুরকে নিয়ে ওরা এমন এক স্থানে পৌঁছলো যেখানে সুড়ঙ্গমুখ এসে সমুদ্রতীরে প্রকাশ পেয়েছে।

সুড়ঙ্গমুখে দুজন লোক দাঁড়িয়েছিলো তারা বনহুরসহ লোক দুজনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চললো। কিছুদূর এগুতেই বনহুর দেখলো একটা জাহাজের পেছন অংশ। একটা ঝুলন্ত সিঁড়ি জাহাজখানার পেছন অংশ দিয়ে উপরে উঠে গেছে।

ভালভাবে বনহুর লক্ষ্য করবার পূর্বেই তার দুটি চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে দেওয়া হলো।

তারপর যখন তার চোখ দুটো মুক্ত করে দেওয়া হলো তখন সে দেখলো গবাক্ষবিহীন এক ক্যাবিন। সম্মুখে একটি চেয়ারে বসে রয়েছে মুখে মুখোশপরা এক ব্যক্তি। তার পাশে দন্ডায়মান আরও কয়েকজন।

বনহুরের চোখ খুলে দিতেই সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মুখোশধারীর দিকে।

মুখোশধারী বললো–এই সেই ব্যক্তি

যারা বনহুরকে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে এসেছে তাদের একজন বললো–হ, এই সেই ব্যক্তি যে শুধু কান্দাই শহরকে প্রকম্পিত করে তোলেনি, সমস্ত পৃথিবী দস্যু বনহুরের নামে কম্পমান।

হাঁ, আমি সেই কারণেই এই ব্যক্তির সন্ধান করে ফিরছিলাম। দুকোটি টাকা এর মূল্য হিসেবে ঘোষণাপত্র দিয়েছিলাম। কারণ এর দ্বারা আমি অসাধ্য সাধন করবো। একটু থেমে বললো লোকটা– পুলিশবাহিনীও একে খুঁজে ফিরছে।

বনহুর লোকটার কথায় বেশ বুঝতে পারলো এরা তার সম্বন্ধে সব কিছুই অবগত আছে এবং তার জন্য যে পুলিশ বাহিনী পৃথিবী ব্যাপী সন্ধান চালিয়ে চলেছে তাও এরা জানে। এরা কারা?

*

হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হবে যদি তুমি আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হও। আমরা যে কাজ দেব করতে হবে তোমাকে? জবাব দাও রাজি আছো? কথাগুলো বললো মুশোখধারী লোকটা।

বনহুর এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো।

এবার সে বললো–আমাকে সময় দাও ভেবে দেখি। হাঁ তার পূর্বে বলতে হবে কি কাজ তোমরা আমাকে দেবে?

হিমাংসু তুমিই বলো কি কাজ আমি ওর দ্বারা করিয়ে নেবো? বললো মুখোশধারী তার এক সঙ্গীকে লক্ষ্য করে।

হিমাংসু নামক ভয়ংকর ব্যক্তি জবাব দিলো–হা আমিই বলছি কিন্তু বলবার পূর্বে ওকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

বললো বনহুর–না আমি কোনো চুক্তিপত্রে সাক্ষর করবো না। যতক্ষণ না তোমরা আমাকে তোমাদের কাজের কথা বলবে?

অবশ্য কথাবার্তাগুলো বাংলা ভাষায় হচ্ছিলো না। তারা ইংরেজিতে কথাবার্তা চালিয়ে চলেছে। তবে একেবারে শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারে না ওরা, কেমন যেন এলোমেলো ছিলো ভাষাটা। বনহুর অবশ্য বুঝতে পারছিলো সব কথাগুলো। তাই জবাব দিতে তার কোন অসুবিধা হচ্ছিলো না।

বনহুরের কথায় বললো মুখোশধারী–বলে দাও হিমাংসু, জেনে নিক সবকিছু ও।

এবার হিমাংসু বললো–জান্নবি পর্বতের নিচে প্রচুর স্বর্ণ রয়েছে তোমাকে সেই স্বর্ণ উদ্ধার করে দিতে হবে। আমি জানি তুমিই অসাধ্য সাধন করতে পারবে এবং সে কারণেই তোমাকে এতদিন খুঁজে ফিরেছি।

যে দুজন বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলো তারা নিশ্চুপ ছিলো এবার তারা কিছু ইংগিতে বললো।

মুখোশধারী তার দ্বিতীয় অনুচরটিকে ইংগিত করলো।

প্রভুর ইংগিত পেয়ে দ্বিতীয় অনুচর ওদিকে একটা ড্রয়ার খুলে বের করে আনলো একটা ব্রিফকেস বা ব্যাগ। ব্যাগটা এনে রাখলো মুখোশধারীর সম্মুখে।

মুখোশধারী ব্যাগটা খুলে এক নজর দেখে নিলো। তারপর যারা বনহুরকে নিয়ে এসেছিলো তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি তার হাতে তুলে দিলো।

লোক দুজনের মুখমন্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

তারা মুখোশধারীকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

ক্যাবিনের সম্মুখ ভাগে একটা জমাট অন্ধকার পথ। ওরা সেই পথে সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছিলো।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন রোলারের আঘাত করলো ভীষণভাবে।

পিছনের ব্যক্তি পড়ে যেতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথায় আঘাত পড়লো। আঘাত নরম নয় ভীষণ কঠিন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো ওরা।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো যে মাথায় আঘাত করেছিলো ওদের। সে ব্রিফকেসটা তুলে নিলো হাতে তারপর সরে গেলো আলগোছে।

ওদিকে বনহুরকে ওরা বন্ধনমুক্ত করে দেবার পূর্বে জাহাজখানা বন্দর ত্যাগ করলো। এতবড় জাহাজ এত দ্রুতগামী এর আগে তেমন একটা বনহুরের নজরে পড়েনি। এই বন্দরটিতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর লক্ষ্য করছিলো একটা জাহাজ বেশ দূরে নোঙ্গর করে আছে। জাহাজটার কোনো দরজা বা জানালা নেই।

তখনই কেমন সন্দেহ জেগেছিলো বনহুরের মনে।

এখন যে জাহাজে তাকে আনা হলো এ জাহাজখানা যে সেই জাহাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দরজা–জানালাহীন জাহাজ, এখন জাহাজ সে দেখেনি কোনোদিন। বনহুর অবাক হয়ে ভাবছে...—-একবার তাকালো সে ওপাশে হিমাংসু নামক ব্যক্তিটির দিকে। ওর কথাগুলো কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হলো, জান্নবী পর্বতের নিচে প্রচুর স্বর্ণ রয়েছে, তোমাকে সেই স্বর্ণ উদ্ধার করে দিতে হবে। আমি জানি তুমিই সেই অসাধ্য সাধন করতে পারবে এবং সে কারণেই তোমাকে এতদিন খুঁজে ফিরছি–একটু হাসলো বনহুর।

মুখোশধারী বললো–চুপ করে আছো কেন জবাব দাও?

বনহুর এবার জবাব দিলো–চুক্তিপত্রে আমি সই করতে রাজি জনই। তবে যা বলবে আমি করতে রাজি আছি।

সত্যি বলছো?

হাঁ, সত্যি বলছি।

বেশ তাহলে তাই হোক। বললো মুখোশধারী।

তার সঙ্গী যারা ছিলো তারা মুখ চাওয়া–চাওয়ি করে নিলো।

মুখোশধারী উঠে কিছু ইংগিত করলো।

দুজন লোক দুপাশ থেকে ধরে ফেললো এবং নিয়ে চললো তাকে টেনেহিঁচড়ে।

মুখোশধারী এবং তার প্রধান সহকারী হিমাংসু চলেছে সর্বাগ্রে। কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই হিমাংসু বলে উঠলো–মালিক, ঐ দেখো....

সবার দৃষ্টি সামনে পড়লো।

দেখতে পেলো কে একজন পড়ে আছে উবু হয়ে। এগিয়ে গেলো মুখোশধারী।

তাকে অনুসরণ করলো সবাই।

নিকটবর্তী হয়ে অবাক হলো মুখোশধারী, এ যে ঐ ব্যক্তি, যার হাতের দুলাখ টাকাসহ কিছু। পূর্বে ব্যাগটা দিয়েছিলো সে। কিন্তু ব্যাগটা গেলো কোথায়? এবং এর অবস্থাই বা এমন হলো কেমন করে? লোকটার মাথায় প্রচন্ড আঘাতের চিহ্ন।

কে এর মাথায় আঘাত করলো?

কি করে এর এমন অবস্থা হলো কেউ ভেবে তার সমাধান পেলো না।

বনহুরের ভ্রুকুঞ্চিত হলো।

সেও ভাবছে এ কেমন করে হলো, তার কাছেও বিস্ময়কর লাগছে ব্যাপারটা। লোকটা তার বিনিময়ে দুলাখ টাকা পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত মনে বিদায় নিয়েছিলো, কিন্তু, এর এমন অবস্থা হলো কি করে

সমস্ত জাহাজখানার মধ্যে একটা আতঙ্ক ভাব পরিলক্ষিত হলো। না জানি কে এই ব্যক্তির মাথায় আঘাত হেনে তার ব্যাগ হস্তগত করে সরে পড়েছে।

বনহুর ভাবছে এমন সময় ঘন্টা বেজে উঠলো। কিসের ঘন্টা জানে না বনহুর। ঘন্টা বেজেই চলেছে, ততক্ষণে জাহাজের সবগুলো যাত্রী বা আরোহী সেই স্থানে এসে দাঁড়ালো। সবার মুখেই একটা উদ্বিগ্নতার চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠছে।

ওরা নিজেরা কিছু বলাবলি করলো, তারপর বনহুরকে নিয়ে চলে গেলো, জাহাজখানার একপাশে একটা ছোট্ট ক্যাবিনে আটকে রাখলো।

বনহুর বুঝতে পারলো নিহত ব্যক্তিটাকে নিয়ে ওরা গবেষণা চালিয়ে চলেছে, তাই তাকে বন্দী করে রাখা হলো। নিশোর কথা বারবার মনে পড়ছে, না জানি বেচারী এখন কোথায়। ওর বাবারই বা কি অবস্থা হয়েছে? দলবলই বা গেলো কোথায়?

ঘন্টাধ্বনি থেমে গেলেও একটা কেমন যেন শব্দ হচ্ছিলো। জাহাজখানা সাধারণ নয়, এটা যে একটা বিস্ময়কর রহস্যময় জাহাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর ক্যাবিনের মেঝেতে বসে পড়লো।

ভাবছে নানা কথধা।

হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো ক্যাবিনের শার্সিটার দিকে। একটা ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো শার্সিটার পাশে।

বনহুর প্রথমে চমকে উঠলো, তারপর কিছু ভেবে মুখে একট টুকরা হাসি ফুটে উঠলো। ঠেশ দিলো সে ক্যাবিনের দেয়ালে।

ছায়ামূর্তি সরে গেলো আলগোছে।

জাহাজের ক্যাবিনটা একপাশে হলেও বেশ বুঝতে পারলো বনহুর জাহাজে একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে। শার্সিটার উপরে বারবার ছায়াপাত হচ্ছে। কিন্তু পূর্বে সে ছায়ার কোনো মিল নেই? বনহুর কিছু ভাবতে শুরু করলো গভীরভাবে।

মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে, দরজা খুলে প্রবেশ করলো মুখোশধারী এবং তার দুজন সঙ্গী।

মুখোশধারী বজ্রমুষ্ঠিতে বনহুরের চুল চেপে ধরলো, প্রচন্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললো– বলল তোমার সঙ্গে এ জাহাজে কে এসেছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো– আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথাগুলো।

বুঝতে পারছো না?

না। কঠিন স্বরে বললো বনহুর।

মুখোশধারী বললো–ঐ ব্যক্তিটা যে নিহত হয়েছে তাকে কে হত্যা করেছে তুমি জানো?

না, আমি জানি না।

জানো না?

না।

মিথ্যা কথা।

সত্য বলছি জানি না।

মুখোশধারী ফিরে তাকালো তার সঙ্গীদ্বয়ের মুখের দিকে।

সঙ্গীদ্বয় মুখ চাওয়া–চাওয়ি করলো।

মুখোশধারী ইংগিত করলো কিছু।

সঙ্গীদ্বয় বনহুরের হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো, তারপর ওরা বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

যাবার সময় বনহুরকে ওরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো ক্যাবিনের দেয়ালে।

বনহুর এতে মোটেই ঘাবড়ালো না, সে জানে তার ভাগ্যে আরও অনেক কিছু ঘটবে বা ঘটতে পারে। তাই সে নীরব রইলো।

হঠাৎ মনে পড়লো তার চৌধুরীবাড়ির কথা! কে জানতো সে এমনভাবে আটকে পড়বে। নূর ফিরে গেছে তারপর সে নিশ্চয়ই পিতার সন্ধানে চিঠিপত্র প্রেরণ করে থাকবে সেই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটার কাছে। বৈজ্ঞানিক মহোদয় যদি কোনো জবাব দেন তাহলে সব ফাস হয়ে যাবে নূরের কাছে, মনিরা নিশ্চয়ই সে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে গেছে মা কত ভাবছেন, না জানি তার মনে কত আশঙ্কা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে হয়তো বা ভাবছেন তার মনির হারিয়ে গেছে চিরতরে … অবশ্য এ ভাবনা তার আজ নতুন নয়, বহুবার তাকে এমনি ধরনের চিন্তায় চিন্তিত হতে হয়েছে। মনে পড়ে আস্তানার কথা, নূরী আর নাসরিনের কথা, রহমান এবং অন্যান্য অনুচরের কথা। সবচেয়ে বড় চিন্তা সুড়ঙ্গপথ খনন চলেছে কান্দাই আস্তানা হতে চৌধুরী বাড়ি পর্যন্ত। হয়তো বা এখন খনন কাজ শেষ হতে চলেছে কিন্তু নূর যদি কোনোক্রমে জানতে পারে এ সুড়ঙ্গপথের কথা তাহলে সে…

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, হঠাৎ দরজা খুলে যায়, দুজন লোক প্রবেশ করে সেই ক্যাবিনে। তাদের হাতে হাতকড়া এবং একটা বিস্ময়কর রশি।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো।

ওরা নিজেরা কিছু ইংগিত করলো।

একজন বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো। ইতিপূর্বে বনহুরের হাতকড়া খুলে দেওয়া হয়েছিলো, পূর্বের ন্যায় বন্দী অবস্থায় নিয়ে চললো ওরা অপর এক ক্যাবিনে।

বনহুর প্রবেশ করতেই তার নজরে পড়লো পূর্বের সেই মুখোশধারী বসে আছে একটা আসনে, তার পাশে একটা অদ্ভুত ধরনের মেশিন। বিরাট আকার একটা মিটারযন্ত্র তার অনতিদূরে। আরও কিছু যন্ত্রপাতি ও মেশিন ক্যাবিনটার মধ্যে ফিট করা রয়েছে। একটা বৃহৎ আকার চক্র, চক্রটার সঙ্গে রয়েছে সরু চেন বা শিকল।

বনহুরকে দেখামাত্র মুখোশধারী উঠে দাঁড়ালো এবং তাকে অভিনন্দন জানানোর মত করে অভিনন্দন জানালো সে।

কিছু বুঝতে পারে না বনহুর, সে চোখেমুখে কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকালো।

মুখোশধারী ইংগিত করলো।

লোক দুজন এবার বনহুরের হাতকড়া খুলে দিলো।

একটা কলিংবেল টিপলো মুখোশধারী!

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনটার মেঝে ফাঁক হয়ে গেলো, একটা টেবিল উঁচু হয়ে উঠলো। টেবিলে নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রী সাজানো।

মুখোশধারী ইংগিত করতেই বনহুরের হাতদুটো মুক্ত করে দেওয়া হলো।

মুখোশধারী বললো–তুমি বড় ক্ষুধার্ত কিছু খেয়ে নাও।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে মুখোশধারীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, সে দেখতে চাইলে ঐ মুখোশের নিচে কেমন একটা মুখ আছে। মুখখানা কেমন দেখার সৌভাগ্য না হলেও আন্দাজ করে নিলো সে মুখোশের নিচে আছে একটা কুচক্রীর কঠিন মুখ। যে মুখ কল্পনার দৃষ্টিতে অতি ভয়ংকর।

বনহুর ফিরে তাকালো নিজের সম্মুখস্থ খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ টেবিলখানার দিকে।

এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিলো যার জন্য বেশিক্ষণ ভাববার সময় তার ছিলো না। হাত দুখানা একটু রগড়ে নিয়ে খাদ্য সম্ভারে ভরা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো তারপর একটা ফল তুলে নিলো হাতে এবং বেশ তৃপ্তি সহকারে খেতে লাগলো।

টেবিলে শুধু ফলমূলই ছিলো না, নানা ধরনের পানীয় ছিলো।

বনহুর ফল ছাড়া কোনো পানীয় পান করলো না। বা কোনো তরল খাদ্যও গ্রহণ করলো না

মুখোশধারী ও তার সঙ্গীদ্বয় একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো।

বনহুর এখন বেশ সুস্থ বোধ করছে।

এবার মুখোশধারী বললো–ওকে কথাগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দাও কি করতে হবে।

একজন অনুচর বললো–মালিক এখনই ওকে কাজে লাগানা কি উচিত হবে?

মুখোশধারী বললো–কেন?

বললো অনুচরটা–জাহাজে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেলো। আমাদের সহযোগী দুজন নিহত হলো তার সঙ্গে উধাও হলো দুলক্ষ টাকাসহ ব্যাগ। কে বা কারা এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটালো এখনও জানা যায়নি।

মুখোশধারী বললো–এজন্য আমি বেশি চিন্তিত নই। কারণ দুলক্ষ টাকাসহ ব্যাগ আমার জাহাজেই আছে এবং ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যাকারীও জাহাজ থেকে সরে পড়ার সুযোগ পায়নি। একটু থেমে বললো মুখোশধারী–আমরা আজ সন্ধ্যায় জান্নাবী পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। আমি একে দিয়ে আজই কাজ শুরু করবো ভাবছি কাজেই তোমরা সেইভাবে প্রস্তুত হবে। যাও হিমাংসুকে পাঠাও, কথা আছে তার সংগে।

চলে যায় একজন।

বনহুর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে, একটা ফল সেই ফাঁকে তুলে নেয় হাতে। ফলটা নেড়েচেড়ে দেখে পুনরায় রেখে দেয় টেবিলে।

মুখোশধারী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–পানীয় পান করো।

বনহুর বললো–কোনো প্রয়োজন নেই।

মুখোশধারীর মুখখানা দেখা না গেলেও বুঝতে পারলো বনহুর মুখোশের নিচে মুখোশধারীর মুখখানায় নিশ্চয়ই পরিবর্তন এসেছে। তবে কি মুখোশধারীর ইচ্ছা তাকে পানীয় দ্রব্য পান করিয়ে কোনো রকমে সংজ্ঞাহীন করা কিন্তু বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো।

বললো মুখোশধারী–এবার কাজ শুরু করো।

কথাটা বলে মুখোশধারী কিছু ইংগিত করলো।

হঠাৎ জাহাজখানার স্পীড বেড়ে গেলো। একটা সুইচ টিপলো মুখোশধারী, সংগে সংগে পাশেই একটা টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো বিস্ময়কর বস্তু। সমুদ্র তলদেশের সামুদ্রিক জীব এবং জলীয় পদার্থগুলো ভেসে উঠলো পর্দায়। একটা ডুবন্ত পর্বতমালার কিছু অংশ নজরে পড়ছে।

জাহাজখানা সেই ডুবন্ত পর্বতমালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

দুজন লোক যারা তাকে এ ক্যাবিনে নিয়ে এলো তারা একটা বিস্ময়কর বাক্স নিয়ে এলো তার সামনে। বাক্সটার তলায় চারটি সংযোগ ছিলো।

খুলে দিলো বনহুরের হাতের কড়া।

মুখোশধারী বললো–প্রবেশ করো ঐ বাক্সটার মধ্যে।

বনহুর বুঝতে পারলে তাকে দিয়ে এবার কাজ শুরু হবে। কিন্তু কি করতে চায় ওরা তাকে নিয়ে....

কি ভাবছো? বললো অনুচরদের একজন।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে বাক্সটার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

মুখোশধারী বললো–থামো।

বনহুর থামলো।

তাকালো সে প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে মুখোশধারীর মুখের দিকে।

মুখোশধারী বললো–তোমাকে জাহাজ থেকে সাগরবক্ষে নামিয়ে দেওয়া হবে, ঐ যে ডুবু পর্বত দেখছো আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো মুখোশধারী টেলিভিশন পর্দায়।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো।

মুখোশধারী আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এলো এবং সে বাক্সটার পাশে একটা তার সংযোগ করে দিলো। সংগে সংগে একটা শব্দ শুরু হলো বাক্সটার পাশে।

এবার মুখোশধারী বাক্সের গায়ে একটি সুইচ টিপলো।

অমনি বাক্সের তালা খুলে গেলো।

মুখোশধারী বললো–আগন্তুক তোমাকে এই বাক্স ঐ ডুবু পর্বতটার পাশে নিয়ে যাবে। এই বাক্স বন্ধ থাকা অবস্থায় তোমার কোনো কষ্ট হবে না মানে ঠিকভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারবে। ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলেই দরজা খুলে যাবে তোমার কোনো কষ্ট হবে না এই বাক্স থেকে বেরিয়ে আসতে। তারপর দেখবে সামনে একটা ডুবু পর্বত এবং সুড়ঙ্গমুখ... ঐ দেখো সুড়ংগ মুখ দেখা যাচ্ছে... মুখোশধারী একটা রড দিয়ে টেলিভিশনে একটা জায়গায় দেখিয়ে দিলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো।

একটু হেসে বললো বনহুর– ঠিক আছে যা করতে বলল রাজি!

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মুখোশধারী, তারপর হাসি থামিয়ে বললো– এবার বুঝতে পেরেছো তাহলে কেন তোমাকে দুকোটি টাকায় খরিদ করেছি? একটু থেমে বললো মুখোশধারী তোমার মূল্য শুধু দুকোটি নয় তার চেয়েও ঢের বেশি। হাঁ, বয়স তোমার বেশ হয়েছে কিন্তু এখনও তুমি সুপুরুষ আছে। শুধু সুপুরুষই নও অসীম শক্তির অধিকারী রয়েছে এ কথা আমি নিজে মেনে নেই।

বললো বনহুর– তুমি তাহলে আগে থেকেই আমার

হাঁ, তোমাকে না চিনলেও তোমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। শোন বনহুর, তোমাকে বহুদিন থেকে খুঁজে ফিরছি। ভাগ্য ভাল তাই তোমাকে পেয়ে গেছি।

বল কি করতে হবে?

আগে তোমাকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

না, কোনো চুক্তিপত্রে আমি স্বাক্ষর করবো না। তবে যে কাজ তুমি করতে বলবে তা আমি করবো কারণ আমি এখন তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছি।

মুখোশধারী বললো–চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করে তুমি ঐ বাক্সে প্রবেশ করলে আমাকে তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে আমার বসের কাছে।

বনহুর বললো– তার জন্য আমি কি করবো। যা বলতে হয় বা করতে হয় তুমি করো।

না, তোমাকে স্বাক্ষর করতেই হবে।

একটা সুইচ টিপতেই বনহুরের সামনে একটা টেবিল উঁচু হয়ে উঠলো। টেবিলটার উপরে রয়েছে একটা মোটা কাগজ আর পেন্সির। খাতার সঙ্গে পেন্সিল স্বর্ণ শিকলে আঁটা ছিলো।

বনহুর বুঝলো এরা খুব চালাক, তার স্বাক্ষর নিয়ে তাকে চিরদিনের জন্য আটক করতে চায়। বনহুর কিছুতেই রাজি হচ্ছিলো না।

মুখোশধারী শুদ্ধ হয়ে উঠলো।

তার চোখ দুটো মুখোশের নিচে আগুনের গোলার মত জ্বলে উঠলো। পা দিয়ে চাপ দিলো সে ক্যাবিনের মেঝেতে একটা বোতামে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের চেয়ার উঠে এলো।

চেয়ারের সঙ্গে নানা ধরনের তার সংযোগ করা আছে।

মুখোশধারী তার অনুচর দুজনকে ইংগিত করলো।

অনুচরদ্বয় বনহুরের দুপাশের বাহু এঁটে ধরলো এবং তাকে ঐ অদ্ভুত চেয়ারটার উপরে বানোর জন্য তাকে জোর করে ধরলো। কিন্তু বনহুরকে এত সহজে চেয়ারে বসানো সহজ নয়। প্রচন্ড এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলো বনহুর অনুচরদ্বয়কে।

মুখোশধারী আশ্চর্য হলো না, সে জানতো বনহুরকে এত সহজে আয়ত্তে আনা যাবে না। সে অনুচরদ্বয়কে কিছু ইংগিত করলো।

বনহুরের হাতকড়া খুলে দেওয়া হয়েছিলো তাই সে মুক্ত, অনুরদ্বয়কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ইচ্ছা করলে সে ঐ মুহূর্তে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো কিন্তু সে ক্যাবিন থেকে বের হয়ে গেলো না। ততক্ষণে আরও দুজন এসে ধরলো বনহুরকে। এবার চারজন অনুচর বনহুরকে ধরে ফেললো এবং তাকে চেয়ারে বসানোর চেষ্টা করলো।

এবারও বনহুরের কাছে পরাজয় বরণ করলো মুখোশধারীর অনুচরগণ।

বনহুর ক্যাবিন থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে এলো জাহাজের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাকালো সমুদ্রের দিকে। সে মুহূর্তে ভেবে নিলো অনেক কথা। এই সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে একটা ডুবুপর্বত যার নাম জান্নবী, তার এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিস্ময়কর জাহাজখানা। এ আশ্চর্য বাক্সটা সাধারণ বাক্স নয়, ওটা কোনো জলযান হবে। যে যানটা তাকে বহন করে নিয়ে যাবে সমুদ্রের গভীর অতলে। পর্বতটার পোশে একটা সুড়ঙ্গমখ আছে। যা টেলিভিশন পর্দায় মুখোশধারী তাকে দেখিয়ে দিলো। ঐ সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে জান্নবী পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে রয়েছে আর ভাববার সময় পায় না, বনহুরের চারপাশে ঘিরে ফেলে অনেকগুলো অদ্ভুত পোশাকপরা লোক।

বনহুর তাকায় সমুদ্রগর্ভের দিকে।

অমনি একটা বিকট ধরনের অট্টহাসি তার কানে ভেসে আসে।

বনহুর ফিরে তাকায় পেছনে।

সঙ্গে সঙ্গে দুচোখ তার বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে যায়।

একটা বৃহৎ আকার গরিলার মত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পেছনে দুহাত প্রসারিত করে।

এমন ধরনের লোক বনহুর এর পূর্বে দেখেনি।

মানুষ নয় যেন কিংকং, গরিলা মহারাজ।

বনহুরকে ধরে ফেললে গরিলা মহারাজ।

চিৎকার করে উঠলো না বনহুর, নিজকে সংযত করে নিলো।

গরিলার মত ব্যক্তিটার হাতের মুঠায় বনহুর দুর্বল হয়ে পড়লো। তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া হলো ঐ ক্যাবিনে। মুখোশধারী পূর্বের আসনে বসে আছে।

বনহুরকে যখন গরিলা মহারাজের মত মানুষটা ঐ ক্যাবিনে নিয়ে এলো তখন মুখোশধারী বললো–কি এবার রাজি?

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

মুখোশধারী বললো–স্বাক্ষর করে। তারপর তোমার দেহে ডুবুরীর ড্রেস পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাকে সমুদ্রতলে পাঠানো হবে।

কিন্তু আমি স্বাক্ষর করবো না।

তোমাকে কারেন্ট লাগানো হবে।

কোনো জবাব দিলো না বনহুর।

ততক্ষণে গরিলাদেহী মানুষটা বনহুরকে ধরে বসিয়ে দেয় অদ্ভুত চেয়ারটার উপরে।

মুখোশধারী একটা সুইচ টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠলো।

মুখোশধারী বললো–বলো এখন স্বাক্ষর করতে রাজি আছো?

যন্ত্রণায় বনহুর মুখটা বিকৃত করে বললো–না, আমি স্বাক্ষর করবো না।

মুখোশধারী চিৎকার করে বললো–সত্যি বলছো?

বললো বনহুর–হাঁ।

মুখোশধারী অপর এক সুইচে চাপ দিলো।

বনহুরের মুখখানা যন্ত্রণায় আরও বেশি বিকৃত হলো। তার সুন্দর মুখমন্ডলে একটা ব্যথাকাতর ভাব ফুটে উঠলো।

ঠিক ঐ সময় একটা মুখ জানালার শার্সীর ফাঁকে ভেসে উঠলো।

এত ব্যথার মধ্যেও বনহুর একটা তৃপ্তিদায়ক নিশ্বাস ফেললো কিন্তু পরক্ষণেই যন্ত্রণায় অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো সে।

বললো মুখোশধারী–কি হলো আমার কথায় রাজি?

বললো বনহুর–না।

সত্যি?

হাঁ।

তবে থাকো! অনুচরদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গেলে মুখোশধারী।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি অনুচর এসে কিছু বললো।

একটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো মুখোশধারী এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো দলবল নিয়ে।

বনহুরকে চেয়ারটার সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে রেখে গিয়েছিলো ওরা এবং মুখোশধারীও সুইচ–অন করে রেখে গেলোলা। যার জন্য বনহুর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছিলো। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে বনহুরের।

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

ইলেকট্রিক কারেন্ট সংযোগ করে দেওয়া ছিলো চেয়ারখানার সঙ্গে– তাই বনহুর অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করছিলো। একটা যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বেরিয়ে আসছিলো তার মুখ থেকে।

সবাই যখন বেরিয়ে গেলো তখন একটা ছায়ামূর্তি প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। অতি লঘু পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো এবং দ্রুত হস্তে সুইচ অফ করে দিলো।

যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেলো বনহুর। রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছিলো সে, মাথা বেয়ে ঘাম ঝরছিলো, অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছিলো তার মুখমন্ডল। সুইচটা অফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর নিশ্বাস নিলো প্রাণভরে।

বনহুর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কালো চাদর সরিয়ে ফেললো ছায়ামূর্তি।

বনহুর বলে উঠলো–নিশো! সঙ্গে সঙ্গে নিশোকে বুকে আঁকড়ে ধরলো বনহুর আনন্দের আবেগে। ভয়ংকর এক যন্ত্রণা থেকে নিশো তাকে মুক্তি দিয়েছে।

নিশোর মাথায় চিবুকটা ঠেকালো বনহুর।

নিশো আনন্দ প্রকাশ না করে নিশ্চুপ রইলো।

বনহুর বললো–নিশো, তুমিই তাহলে ঐ ব্যক্তিটাকে হত্যা করেছো? তুমিই তাহলে....

বনহুরের কথা শেষ হয় না ঐ ক্যাবিনে প্রবেশ করে দুই ব্যক্তি।

বনহুর মুহূর্তে নিশোকে নিয়ে বেরিয়ে যায় ক্যাবিন থেকে কিন্তু রেহাই পায় না, ক্যাবিনের বাইরে আরও কয়েকজন এগিয়ে আসছিলো তারা পাকড়াও করে ফেললো বনহুর আর নিশোকে।

ততক্ষণে মুখোশধারী ও বিশালদেহী লোকটা সেই স্থানে এসে পড়ায় অনুচরগণ বনহুরকে ধরে নিয়ে হাজির করলো তার সামনে।

নিশোকে দেখিয়ে বললো– এই তরুণী বন্দীকে তার চেয়ার থেকে উদ্ধার করেছে এবং তাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিলো।

মুখোশধারী ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠলো, তারপর বললো–পালাতে চেষ্টা করেছিলো? কিন্তু কোথায় পালাবে! এ জাহাজ থেকে কারও পালানোর উপায় নেই। এই তরুণী কে?

অনুচরদের একজন বললো–এই তরুণীই ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যাকারিণী।

অপর একজন অনুচর একটা লোহার রড নিয়ে এগিয়ে এলো–এই দেখুন মালিক, এই রড দ্বারা তরুণী লোক দুজনকে হত্যা করেছে এবং তার ব্যাগ নিয়ে উধাও হবার চেষ্টা চালিয়েছে।

আমারও এই রকম সন্দেহ হয়েছিলো। বললো অপর একজন অনুচর।

মুখোশধারী বললো– এই তরুণীই ওদের হত্যা করেছে এটা সত্যি কিন্তু এই রড দ্বারা সে ওদের হত্যা করেছে তার কোনো প্রমাণ আছে?

আছে মালিক। এই দেখুন রডে এখনও রক্তের ছাপ শুকিয়ে আছে। এই রড দিয়ে তরুণী ওদের হত্যা করেছে তাতে কোনো ভুল নেই।

নিয়ে চলো, দুজনকেই আমি কারেন্ট সংযোগ করে শাস্তি দেবো। মুখোশধারী কথাটা বলে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

অনুচরদের সঙ্গে বিশালদেহীও যোগ দিয়ে বনহুর আর নিশোকে নিয়ে এলো সেই ক্যাবিনে যে ক্যাবিনে বনহুরকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে কারেন্ট দ্বারা যন্ত্রণা দিচ্ছিলো।

মুখোশধারী তার আসনে এসে বসে অপর একটা সুইচ টিপলো।

অমনি আর একটা চেয়ার বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের তল থেকে।

একটা চেয়ারে বনহুর আর অপরটাতে নিশোকে বসিয়ে দিয়ে অপর দুটি সুইচ টিপলে মুখোশধারী, অমনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো নিশো।

বনহুর মুখখানা বিকৃত করে ফেললো।

অট্টহাসি হেসে উঠলো মুখোশধারী।

নিশোর যন্ত্রণাভরা চিৎকার বনহুরকে ভীষণ কাতর করে তুললো। বনহুর নিজের যন্ত্রণা ভুলে গেলো নিশোর মর্মান্তিক কাতর চিঙ্কারে, সে তাকালো নিশোর দিকে।

নিশো ছটফট করছে।

তার সমস্ত দেহ আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

কি সাংঘাতিক কষ্ট, কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা।

নীরবে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এ মুহূর্তে।

*

আশা হাত বাড়ালো সামনে।

নূরী তার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের হাতখানা এগিয়ে দিলো।

আশা ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো–এমনি করে আর কতদিন তুমি আমার সেবাযত্ন করবে বোন!

নূরী বললো–যতদিন তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে না আসে ততদিন তোমাকে আমি আগলে রাখবো।

কিন্তু কোনোদিন কি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে? আমি কি আবার তোমাদের দেখতে পাবো? ব্যথারুণ কণ্ঠে বললো আশা। তার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

নূরী নীরবে তাকিয়ে আছে আশার সুন্দর কোমল মুখখানার দিকে। ব্যথারুণ সে মুখ, নূরী ভাবে এই রানীই তার হুরকে বহুবার বাঁচিয়েছিলো কঠিন মৃত্যুর কবল থেকে। হুর তার জীবন, তার শান্তি সুখ সব কিছু... আজ যদি হুর মৃত্যুবরণ করতো তাহলে নূরীও আত্মাহুতি দিতো কারণ তার সাধনা তার স্বপ্ন সবকিছু হুর।

নূরীকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বললো আশা–বোন কি ভাবছো।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বললো নূরী–কিছু না।

বোন, তুমি লুকোতে চাইলেই কি লুকোতে পারবে? তুমি কাঁদছ।

নূরীর অশ্রু বাধা মানে না সে বলে উঠে–বোন, কান্না যে আমার সাথী হয়েছে। জানো তো কতদিন আমার হুরের কোনো সন্ধান পাই না। না জানি সে কোথায় আছে কেমন আছে… বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তার গলাটা।

আশা নূরীর ব্যথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। .

তার চোখ দুটোও অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠে।

নূরী বুঝতে পারে আশার মনেও কম দুঃখ নেই। একদিন আশা তরুণী ছিলো আজ সে বয়স। পেরিয়ে এসেছে কিন্তু তার স্বপ্ন সাধনা সফল হয়নি। বনহুরকে আশা অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলো, তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো সে, বনহুরকে কেন্দ্র করে আশা অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলো কিন্তু সে তাকে পায়নি কোনোদিন আপন করে…নূরী জানে এ ব্যথা কত কঠিন কত বেদনাদায়ক। আশাকে একদিন নূরী হিংসা যে করতো না তা নয় তবে আজ সে ভুল ভেঙে গেছে।

নূরী জানে ভালবাসা পাপ নয়, ভালবাসা অতি পবিত্র। পিতা–মাতা সন্তানকে ভালবাসে, ভাই বোনকে ভালবাসে, বোন ভাইকে ভালবাসে। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে। সন্তান তাদের পিতামাতাকে ভালবাসে। কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে ভালবাসে আর কোনো নারী যদি পুরুষকে ভালবাসে আর তা যদি পবিত্রতায় ভরা হয় তাহলে তাতে দোষ কি অপরাধই বা কোথায়। তবে অপবিত্রতায় ভরা ভালবাসা নির্মল নয়, পবিত্র নয়, তাতে অপরাধ আছে এ সব কি ভাবছে নূরী নিজেই জানে না। এমন এলোমেলো চিন্তা কেন তার মাথায় আসছে ভেবে পায় না। সে। তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বলে– চলো বোন বাইরে ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসি।

বললো আশা–চলো।

নূরীর হাত ধরে আশা বেরিয়ে আসে ভূগর্ভ আস্তানা থেকে। পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নেয় আশা।

এগিয়ে যায় ওরা ঝর্ণার দিকে।

নুরী আর আশা চলতে চলতে কত কথা বলে।

আশা বলে–সত্যি কি আর কোনোদিন আমার জাভেদকে দেখতে পাবো না?

নূরী বলে– ছিঃ মিছেমিছি বেশি চিন্তা করছো বোন। হুর ফিরে এলেই তোমার চোখের জন্য ব্যবস্থা করবে। আমি জানি তার অসাধ্য কিছু নেই। পৃথিবীতে কত বড় বড় ডাক্তার আছে যারা মানুষের চোখ নিয়ে নানাভাবে গবেষণা করছেন। অপরের চোখ নিয়ে যে কোনো অন্ধ ব্যক্তির চোখে সংযোজন করে দিয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে আনছেন। জানো বোন আশা, হুরের মুখে আমি এমনি কত গল্প শুনেছি।

না বোন, আমি অপরের দৃষ্টি নিয়ে আমার জাভেদকে দেখতে চাই না। আমি চাই আমার চোখ দিয়ে আমার জাভেদকে দেখবো

তাই হবে আশা আম্মু।

কে?

জাভেদ এসে মা ও আশা আম্মুর পেছনে দাঁড়িয়েছে। বলে জাভেদ– আমি সন্ধান নিচ্ছি কোন ডাক্তার তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে।

বললে নূরী–জাভেদ তাই কর বাপ। তো আশা আম্মুর দৃষ্টিশক্তি যতদিন ফিরে না এসেছে ততদিন আমি নিজেও কোনো মতেই শান্তি পাবো না।

আমিও পাবো না আম্মি। বললো জাভেদ।

আশা দুহাত জাভেদের দিকে বাড়িয়ে দিলো–বাপ আমার, সত্যি আমি বড় অভিশপ্ত মেয়ে। তোদের শান্তি আমি কেড়ে নিয়েছি।

ছিঃ! বোন ও কথা বলো না। তুমি যে আমাদের প্রিয়জন। জাভেদ তোমাকে ভালবাসে, আমার চেয়েও তোমাকে সে বেশি শ্রদ্ধা করে। তুমি তো জানো বোন, জাভেদকে যেদিন আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি সেদিন থেকে আমি কত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সে ভরসা তোমার রক্ষা করতে পারলাম কই। আশা জাভেদকে কাছে টেনে নেয়, আদর করে আশা জাভেদের বুকে হাত বুলিয়ে দেয়।

এমন সময় একটা শব্দ হয় অদূরে বনের মধ্যে।

জাভেদ চমকে ফিরে তাকায়।

নরীও তাকায় কিন্তু কিছুই নজরে পড়ে না।

শব্দটা কিসের?

জাভেদ বললো–কোনো হিংস্র জন্তু নয় তো? আম্মি, তুমি আশা আম্মুর পাশে থাকো, আমি এক্ষুণি দেখে আসছি।

কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নেয় জাভেদ পিস্তলখানা, তারপর দ্রুত চলে যায় যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিলো সেইদিকে।

আলগোছে পা ফেলে এগুতে থাকে জাভেদ। হাতে পিস্তল, দৃষ্টি সতর্ক। কিন্তু কই কিছুই তো নজরে পড়ছে না। অনেকটা এগিয়ে আসে জাভেদ। একটা ঝোঁপের আড়ালে কিছু নড়ছে বলে মনে হলো তার।

জাভেদ পিস্তল ঠিক রেখে এগুতে লাগলো।

ঝোঁপটা মৃদু মৃদু দুলছে।

জাভেদ ঝোঁপটার ওপাশে চলে যায়।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো জাভেদ, রাগে গম্ভীর হয়ে ওঠে তার সুন্দর উজ্জ্বল দীপ্ত মুখখানা। কঠিন কণ্ঠে বলে–ফুল্লরা, এখানে কেন?

কোনো জবাব দেয় না ফুল্লরা।

সে আঁচলের খুটটা আংগুলে জড়াতে থাকে বারবার। এক একবার চোখ দুটো তুলে ধরছিলো জাভেদের মুখের দিকে।

জাভেদ কঠিন কণ্ঠে বললো–কি, জবাব দিচ্ছো না কেন? বলো কেন ঝোঁপের আড়ালে আত্মগোপন করে এমন শব্দ করছিলো? বলো জবাব দাও?

খুঁজছিলাম। বললো ফুল্লরা।

খুঁজছিলে?

হাঁ।

কি খুঁজছিলে?

তোমাকে।

আমাকে?

হাঁ।

আমাকে ঐ ঝোঁপের মধ্যে খুঁজছিলে? আমি কি জানোয়ার।

না।

তবে আমাকে ঝোঁপটার মধ্যে কেন খুঁজছিলে?

বলবো না।

ফুল্লরা, তুমি দিন দিন বড় বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। তোমার আচরণ আমার মোটেই পছন্দ হয় না।

সত্যি বলছো এ কথা?

তবে কি মিথ্যা বলছি।

আমি তোমাকে ভালবাসি জাভেদ।

ওঃ কি মুস্কিল... ভালবাসবে তা বাসবে। কিন্তু ঝোঁপ–জঙ্গলে কেন?

কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি।

কেন? আমি কি জানোয়ার না জন্তু

কোনো জবাব দেয় না ফুল্লরা।

বলে জাভেদ–খবরদার, আর কোনোদিন তুমি আমাকে ঝোঁপ-জঙ্গলে খুঁজবে না।

তবে কোথায় পাবো তোমাকে?

কেন আমাকে তোমার কি দরকার?

বলতে পারবো না।

তাহলে অমন দরকারে কোনো কাজই নেই। যাও আস্তানায় চলে যাও। চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় জাভেদ।

ফুল্লরা বলে–চলে যাচ্ছো?

হাঁ।

কিন্তু আমি তোমাকে যে খুঁজছিলাম।

বলো কেন খুঁজছিলে?

এখন বলবো না।

তবে আমিও দাঁড়াতে পারব না, চললাম। জাভেদ চলে যায়।

ফুল্লরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর এগিয়ে যায় নূরী ও আশার পাশে।

বলে নূরী– ফুল্লরা।

বলো?

কোথায় ছিলি মা এতক্ষণ?

আস্তানায়।

কিন্তু তোকে যে দেখতে পেলাম না।

বলল কি করতে হবে?

তোমার আশা আম্মুকে একটা গান শোনাও।

গান?

হাঁ, একটা গান গাও।

কিন্তু...

কোনো কিন্তু লাগবে না বা শুনতে চাই না। তোমার আশা আম্মুর মন ভাল নেই। একটা গান শুনাও। বললো নূরী।

আশা হাত বাড়িয়ে ফুল্লরাকে বললো–গাও মা একটা গান গাও। কতদিন তোমার গান শুনে আমি ঘুমিয়েছি। তুমি যে আমার গানের রাণী...

এবার ফুল্লরা বললো–বেশ, গাইছি।

আশার হাত ধরে ফুল্লরা বসলো।

নূরী বসলো তার পাশে।

ফুল্লরা গান গাইলো।

অপূর্ব সে সুর। নির্জন জঙ্গলের মধ্যে অজানা গাছের ডালে ডালে লাগালো শিহরণ। সে এক অপূর্ব পরিবেশ, আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

সামনে ঝর্ণার পানি কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। আকাশের কিছু কিছু অংশের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে কাকচক্ষুর স্বচ্ছ পানির বুকে।

ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে আকাশে হাল্কা মেঘের আনাগোনা। ঝর্ণার পানিতে সাদা পাল তোলা নৌকার মতই ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছিলো। অপূর্ব সে দৃশ্য।

ফুল্লরার গান গাওয়া শেষ হয়।

এবার আশা ফুল্লরার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়, বলে সে–চলো ফিরে যাই আস্তানায়।

নূরীও উঠে পড়লো আশা আর ফুল্লরার সঙ্গে।

*

মিঃ রাওলা ভৌমের কন্যা মতিবাঈয়ের আজ জন্ম উৎসব। কান্দাই শহরের নামকরা ধনবান ব্যক্তি মিঃ রাওলা ভৌম।

কোটিপতিই শুধু তিনি নন, কয়েকটা ইন্ডাষ্ট্রীর মালিক মিঃ ভৌম। প্রতিদিন তার যে আয় তাতে প্রায় লক্ষ টাকা আসে। এহেন ব্যক্তির কন্যা মিস মতিবাঈয়ের জন্ম উৎসব যে কত জৌলুসপূর্ণ হতে পারে তা অতি সহজেই অনুমেয়।

ভৌমবাড়ি আলোয় আলোময়।

শুধু বাড়ি নয়, কান্দাই শহরের প্রায় অর্ধেক শহর সাজানো হয়েছে।

গেটের দুপাশে নানা বর্ণের নানা জাতের মোটর কারের ভীড়।

হলঘরে বসেছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

মূল্যবান অলংকার ভূষিতা মতিবাঈ এলো পিতার হাতে হাত রেখে হলঘরে।

সামনে বিরাট টেবিল।

টেবিলে ঝাড়বাতি আর নানা রঙের ফুলে ফুলে সজ্জিত ফুলদানী।

ফুলের সৌরভে ভরা কক্ষটির পরিবেশ।

একপাশে বাদ্যযন্ত্র অপূর্ব সুরের ঝংকারে মাতিয়ে তুলেছে অতিথিবৃন্দের হৃদয় রাজ্যকে।

মিঃ ভৌমের সঙ্গে ভৌমকন্যা এসে দাঁড়াতেই কক্ষের অতিথিবৃন্দ উঠে দাঁড়ালেন।

বাদ্যযন্ত্রগুলো নতুন সুরে বেজে উঠলো।

সবার চোখেমুখে উচ্ছল আনন্দ ঝরে পড়ছে।

আলোর বন্যায় ভেসে গেছে চারদিক। দেয়ালে নানাবর্ণের কারুকার্য করা তৈলচিত্রগুলো আলোর ছটায় ঝলমল করছে।

মনিমুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণা মতিবাঈ হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে আলো নিভে গেলো, একটা তীব্র আর্তনাদ। পরক্ষণেই একটা নারীকন্ঠের আর্তচিৎকার কিন্তু ক্ষণিকের জন্য ঐ সময় আলো জ্বলে উঠলো।

সবাই নিজ নিজ আসনের পাশে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। সকলের চোখেমুখেই উৎকণ্ঠা আর ভীতির ছাপ।

আলো জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখলেন মিঃ ভৌমের রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে আছে, মিস মতিবাঈ উধাও হয়েছে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না কোথাও।

এত আনন্দ মুহূর্তে উবে গেলো কোথায়!

একটা ভয়ংকর ভীতিভাব ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। সমস্ত উজ্জ্বল আনন্দ এক দন্ডে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ যে যে পথে পারলো সরে পড়লো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেলো চারদিক।

ভৌম বাড়ির সামনের রাজপথ জনশূন্য হয়ে পড়লো অল্পক্ষণের মধ্যেই কাউকে চোখে পড়ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে পুলিশ ভ্যানের হর্ন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কান্দাই পুলিশমহল হাজির হলো সেখানে।

এলেন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান।

নূরও এসেছে।

সবাই লাশ পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো এ হত্যাকান্ড সাধারণ খুনীর দ্বারা সংঘটিত হয়নি, এর পেছনে আছে অতি সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারসাজি।

সকলেই ধারণা দস্যু বনহুর ছাড়া এ কাজ আর কারও দ্বারা সংঘটিত হয়নি এবং মিস মতিবাঈকে সেই উধাও করেছে।

সবার মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো।

জোর তদন্ত শুরু হলো।

বনহুর ছাড়া এ কাজ যে আর কেউ করেনি বা করতে পারে না এটাই সবার ধারণা।

পুলিশ ফোর্স ছুটলো ভ্যান নিয়ে।

চারদিকে সতর্ক সন্ধান শুরু হলো।

মিস মতিবাঈকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে। ওয়্যারলেসে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো কান্দাইয়ের বিভিন্ন এলাকায়।

মিঃ ভৌমের লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হলো।

তাকে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি অস্ত্র তা বোঝা মুস্কি। অভিজ্ঞ গোয়েন্দা এবং জাদরেল পুলিশ প্রধানও কেউ সঠিকভাবে এর কোনো হদিস খুঁজে পেলেন না।

মিঃ ভৌমের লাশ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা চললো।

পুলিশমহলে এ ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা গবেষণা চললো।

মিঃ জায়েদী এখন পুলিশপ্রধান।

তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ এই রহস্যময় হত্যাকান্ডের কোনোও সূত্র আবিষ্কার করতে তিনি নিজেও সক্ষম হলেন না।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং নুরকে নিয়ে মিঃ জায়েদী আলোচনা করছিলেন।

তাদের সম্মুখস্থ টেবিলে মিঃ ভৌমের পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট মেলানো হয়েছে।

বললেন মিঃ জায়েদী– মিঃ ভৌমকে কোন সূতীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে কিন্তু সেই সূতী অস্ত্রটি কোনো ছোরা বা ঐ জাতীয় বস্তু নয়।

বললেন প্রবীণ গোয়েন্দা মিঃ শংকর রাও–, এ কথা সত্য। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে তাই বলা হয়েছে। এমন কোনো অস্ত্র দ্বারা মিঃ ভৌমের পাজরে আঘাত করা হয়েছে যা ছোরা বা ঐ ধরনের কোনো বস্তু নয়।

বললেন মিঃ হারুন আমার মনে হচ্ছে কোনো বাকা বস্তু দিয়ে মিঃ ভৌমের পাঁজরে আঘাত করে তাকে হত্যা করে হয়েছে। বাকা বস্তুটি কোনো সাড়াসি বা শরকি ধরনের হবে।

বললেন মিঃ জায়েদী–হা ঠিক বলেছেন মিঃ নূর, আপনার অনুমান ঠিক কারণ পোস্টমমেটম রিপোর্টে সেই রকমই বলা হচ্ছে। কোনো বাকা অস্ত্র দ্বারা মিঃ ভৌমকে হত্যা করা হয়েছে।

নূর এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলো, এবার সে বললো–মিঃ ভৌমকে যে কোনো অস্ত্র দ্বারাই হত্যা করা হোক না কেন, তিনি নিহত হয়েছেন কাজেই আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা এবং তার কন্যা মিস মতিবাঈয়ের সন্ধান করা। আমার মনে হয় আমরা কৃতকার্য হবোই।

আপনার কথা ঠিক তাতে কোনো ভুল নেই। এবং সেই মতই আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে। কথাগুলো বললেন মিঃ জায়েদী।

নির্জন কক্ষে কয়েকজন পুলিশ প্রধান এবং ডিটেকটিভ বসে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সবাই মিঃ ভৌমর অদ্ভুত নিহত ব্যাপার এবং তার কন্যা মিস মতিবাঈয়ের নিরুদ্দেশের ঘটনা নিয়ে ভাবছেন।

সকলের অনুমান দস্যু বনহুর ছাড়া এ কাজ কেউ করেনি।

এমন সময় পুলিশ মহলের একজন হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং সবাইকে লক্ষ্য করে সেলুট করলেন।

আগন্তুকটি কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লে তার উপরে।

লোকটার হাতে একটা রুমাল জড়ানো বস্তু পরিলক্ষিত হলো। সবার মনে প্রশ্ন জাগলো না জানি কি হয়েছে আগন্তুকটার হাতে।

কেউ কোনো প্রশ্ন করার পূর্বেই বললেন পুলিশ অফিসারটা–স্যার, কান্দাইয়ের অদূরে সিন্ধি পর্বতের পাদমূলে এই অস্ত্রটা পাওয়া গেছে।

কথা শেষ করে অস্ত্রটা মেলে ধরলেন তিনি পুলিশপ্রধান মিঃ জায়েদীর সামনে।

সবার দৃষ্টি স্থির হলো বস্তুটার দিকে।

দেখলেন একটা তীক্ষ্ণ ধারালো বাঁকা বাঁশরী। অদ্ভুত বিস্ময়কর বাঁশরী বটে। বাশরীর মতো বস্তুটা হলেও ঠিক বাঁশরী নয়–একটা মারাত্মক অস্ত্র।

মিঃ জায়েদী অদ্ভুত অস্ত্রটাকে স্পর্শ না করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে বললেন–এমন ধরনের অস্ত্র আমার দৃষ্টিতে এই প্রথম। একটু থেমে বললেন তিনি–এ ধরনের অস্ত্র একমাত্র দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করে না আমি জানি।

নূর এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনছিলো, এবার সে বললো–দস্যু বনহুর এতদিন পর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

তাইতো মনে হচ্ছে। বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জায়েদী বললেন–সিন্ধি পর্বতের পাদমূলে এই অস্ত্র পাওয়া গেছে, কাজেই আমাদের ঐ স্থানে গমন করা উচিত।

হাঁ, সিন্ধি পর্বতেই আমরা সন্ধান পাবো এই বিস্ময়কর হত্যা রহস্যের। কথাটা বললো নূর।

এমন সময় একটা লোক প্রবেশ করে বললো–স্যার, একটা জরুরি সংবাদ আছে।

সবাই তাকালেন লোকটার দিকে।

দেখলেন লোকটার হাতে একটা কাগজে মোড়ানো বস্তু। অবাক হলেন সবাই। কে এই লোক, সবার চোখে প্রশ্নভরা দৃষ্টি।

লোকটা মোড়ক খুলে ফেললো।

সবাই দেখলেন কয়েকটা ফল।

ফলগুলো অচেনা বলা যায়, কারণ এমন ফল তারা দেখেননি কোনোদিন।

লোকটা ফলগুলো টেবিলে রেখে যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো কেউ কোনো কথা বলার পূর্বেই।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশপ্রধান লোকটাকে কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু কারও কিছু বলা হলো না।

মিঃ জায়েদী তবু বললেন–দাঁড়াও! কে তুমি? এ ফল কে পাঠিয়েছে।

কিন্তু লোকটা ততক্ষণে উধাও হয়েছে।

মিঃ হারুন কুদ্ধকণ্ঠে বললেন–কে ওকে এ কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলো?

একজন পুলিশ প্রহরীকে ডেকে মিঃ জায়েদী সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

পুলিশ প্রহরী বললো–স্যার, আমরা তাকে প্রবেশ করতে দেইনি তবু সে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছে। বলেছে, আমি মিঃ নূরের জন্য কিছু ফল এনেছি তাকে দিতে চাই।

নূর বিস্ময়কর চোখে তাকালো প্রহরীটার দিকে।

মিঃ জায়েদী বললেন– লোকটা তো এখানে প্রবেশ করে তেমন কোনো উক্তি উচ্চারণ করেনি।

মিঃ হারুন একটা ফল হাতে তুলে নিয়ে বললেন–কি তাজ্জব ব্যাপার, আসলে এগুলো বাস্তব ফল নয়।

সবাই অবাক হলেন।

নূর একটা ফল তুলে নিয়ে বললো–নিশ্চয় এসব ফলের মধ্যে কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য আছে।

মিঃ জায়েদী বললেন–তাই নাকি?

মিঃ হারুণ বললেন–হাঁ স্যার, এগুলো সাধারণ ফল নয়। কোনো মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্য।

মিঃ জায়েদী বললেন–মুহূর্ত বিলম্ব না করে যাও লোকটাকে গ্রেপ্তার করো।

পুলিশপ্রধান এবং ডিটেকটিভ কর্মকর্তাগণ সবাই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

নূর বিলম্ব না করে ছুটলো। সবাই বেরিয়ে এলেন কক্ষের বাইরে।

পুলিশমহল আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে দৌড় দিলো! কিন্তু লোকটা যেমন দ্রুতগতিতে প্রবেশ করেছিলো তেমনি বেরিয়ে গিয়েছিলো, অনেক সন্ধান করেও আর তাকে পাওয়া গেলোনা।

নূর তাড়াতাড়ি গাড়িতে চেপে বসলো। তার পাশে বসলেন মিঃ হারুন এবং শংকর রাও।

মিঃ জায়েদী নেমে এসেছেন সিঁড়ির শেষ ধাপে। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন অন্যান্য অফিসার।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বিরাট শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটলো। ভীষণ আওয়াজে কানে তালা লেগে গেলো সকলের। সঙ্গে সঙ্গে দালানের ছাদ ধসে পড়লো, বেলকুনি রেলিং থাম সব ভেঙে পড়তে লাগলো। সে এক ভয়ংকর কান্ড।

ভাগ্যিস, মিঃ জায়েদী দলবল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তাই রক্ষা পেলেন।

পূর, মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাওয়ের জীবন রক্ষা পেলো। তবে প্রহরী পুলিশটি ছাদচাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করলো, কারণ সে কক্ষের বাইরে না এসে দরজার পাশে দন্ডায়মান ছিলো।

নূরাও তার সঙ্গীদ্বয়ের গাড়ি ছাড়তে বিলম্ব হলো।

কোন পথে লোকটা চলে গেছে এটা কেউ বুঝতে পারলেন না। কাজেই তারা গাড়ি ত্যাগ করে সন্ধান চালালেন। খুব করে খুঁজলেন আশেপাশে কিন্তু লোকটার কোন সন্ধান পেলেন না তারা।

নূর এবং তার সঙ্গীরা ভাবতেও পারেননি এমন একটা কান্ড ঘটে যাবে। আর কিছু সময় তারা ঐ কক্ষে থাকলে এ মুহূর্তে তাদের ভাগ্যে কি ঘটতো তা সবাই অনুধাবন করলেন।

নূরের মুখমন্ডল রাগে রাঙা হয়ে উঠেছে। সে আর বিলম্ব না করে মিঃ জায়েদীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললো–শুধু মিঃ ভৌমকে হত্যা এবং তার কন্যাকে হরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি হত্যাকারী, সে বা তার দল আমাদের পিছু লেগেছে। আমরা যে মিঃ ভৌমের হত্যাকারী এবং তার কন্যার সন্ধানে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছি, এ কারণেই আমাদের হত্যার নতুন পদ্ধতি তারা বেছে নিয়েছে।

মিঃ জায়েদী বললেন–হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ নূর। হত্যাকারী নরপশু দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কেউ নয়। সে তার দক্ষ অনুচরগণদের দ্বারা আমাদের পুলিশমহল নিপাত করার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে। এখন থেকে আমাদের অতি সাবধানে কাজ করতে হবে।

মিঃ হারুন বললেন–ফলের আকারে বিস্ফোরক বস্তু আনা হলো অথচ আমরা তাকে আটক রাখতে পারলাম না।

প্রথমেই তাকে আমাদের সন্দেহ করা উচিত ছিলো। কথাটা বললেন মিঃ শংকর রাও।

হা, লোকটার আচমকা প্রবেশ আমাদের বিস্মিত করলেও আমরা তেমনভাবে সন্দেহ করতে পারিনি, এটা বড় ভুল হয়ে গেছে। বললেন মিঃ জায়েদী।

নূর বললো–যা গত হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়।

মিঃ জায়েদী বললেন–ঠিক বলেছেন মিঃ নূর, এমন মুহূর্তে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সম্মুখে বিধ্বস্ত পুলিশ অফিস এখনও ধসে পড়ছে।

অল্পক্ষণেই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে চারদিকে। ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দে কান্দাই শহরের অনেকেই ছুটে এসেছে ঘটনাস্থলে।

সবার চোখেমুখে বিস্ময়, হঠাৎ পুলিশ অফিসের অভ্যন্তরে এমন বিস্ফোরণ সংঘটিত হলো কি করে? কিন্তু কে তার জবাব দেবে, পুলিশমহল তখন সবাই ব্যতিব্যস্তভাবে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে।

নূর কোনো কথাই ভ্রুক্ষেপ না করে গাড়িতে চেপে বসলো।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন চেপে বসলেন সেই গাড়িতে। সবার নিকটেই রয়েছে গুলীভরা পিস্তল। মিঃ হারুন বললেন–আমরা এখন কোথায় চলেছি?

নূর ড্রাইভ করছিলো, সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো–আমরা সিন্ধি পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

বললেন মিঃ হারুন–সিন্ধি পর্বত সে তো কান্দাই শহর থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে।

যতদূরই যোক আমরা সিন্ধি পর্বতের পাদমূলে যাবোই। কারণ সেখানেই পাওয়া গেছে সেই বাঁশরী ধরনের বিস্ময়কর অস্ত্র, যে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করা হয়েছিলো মিঃ ভৌমকে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর নূর শহর অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রান্তরের পথ ধরে গাড়ি এগুতে লাগলো। এতক্ষণ স্পীডে গাড়ি চালালেও এবার গাড়ির বেগ কমে এলো।

দুঃসাহসী নূর উঁচু নীচু পথেও গাড়ি যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে চালিয়ে চলেছে যেন শীঘ্র পৌঁছতে পারে। মিঃ হারুন এবং শংকর রাও আশ্চর্য হয়ে গেছেন এমন স্পীডে গাড়ি চালাতে কোনো দক্ষ ড্রাইভারও পারবে না। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে যান বিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তাদ্বয়।

সিন্ধি পর্বতের পাদমূলে এসে গাড়ি থামলো।

এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূর এবং পুলিশ অফিসারদ্বয় নেমে পড়লেন।

শংকর রাও দক্ষ পুলিশ গোয়েন্দা, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেমন যেন একটা সন্দেহের ছায়া পড়লো তাঁর মনে। বললেন মিঃ শংকর রাও–মিঃ নূর, পুলিশ ফোর্স না নিয়ে আসাটা আমাদের ঠিক হয়নি।

নুর বললো–স্যার, আমার মনে হয় প্রথমেই পুলিশ ফোর্সের কোনো দরকার হবে না। কারণ আমরা আজ সন্ধান নিয়ে ফিরে যাবো....

কথা শেষ হয় না, একটা পাথর পর্বতমালা থেকে গড়িয়ে আসে নিচের দিকে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূর মিঃ হারুন ও মিঃ শংকর রাওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজেও সরে দাঁড়ায়।

বিরাট পাথরখানা গড়িয়ে এসে পড়ে গাড়িটার উপরে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানাতে আগুন ধরে যায়।

চোখের সামনে তাদের গাড়িখানা দাউ দাউ করে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে পড়ে নূর ও তার সঙ্গীদ্বয়।

মিঃ হারুন বলে উঠলেন–এবার আমাদের সব আশা–ভরসা নির্মূল হয়ে গেলো।

মিঃ শংকর রাও বিজ্ঞ গোয়েন্দা, তিনি কি যেন গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

. নূর বললো–ভেবে কোনো ফল হবে না। আমরা যে জীবনে বেঁচে রইলাম সেটাই আমাদের ভাগ্য। নইলে গাড়িখানার সঙ্গে আমরাও থেতলে মাংসপিন্ডে পরিণত হতাম।

মিঃ হারুন বললেন–তা ঠিক কিন্তু আমরা এখন এমন এক মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি যে কোনো দন্ডে আমাদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

হেসে বললো নূর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই তো আমরা এসেছি স্যার।

নূরের কথাটা মিঃ শংকর রাওয়ের কানে একটা পরিচিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি জাগালো।

নুর বললো–স্যার, গাড়িখানা তো হারালাম। তবে একটা আশ্বাস আমরা পেয়েছি যে, এই পর্বতের অভ্যন্তরেই রয়েছে মিঃ ভৌমের হত্যাকারী এবং মিস মতিবাঈ...

হঠাৎ নূরের দৃষ্টি চলে গেলো অনতি দূরে। একটা সাদামত ক্ষুদ্র পদার্থের উপরে। পদার্থটা কি জানবার জন্য নূর এগিয়ে গেলো।

নিকটে পৌঁছতেই দেখলো সাদা ক্ষুদ্র পদার্থটা একটা সিগারেটের টুকরা।

দুচোখে তার বিস্ময় ঝরে পড়লো।

এ সিগারেটটা সাধারণ নয়, এমন কোনো ব্যক্তি এ সিগারেট পান করে যার প্রতিদিন আয় কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকা। তবে কে সে ব্যক্তি নূর সিগারেটের টুকরাটা সঙ্গীদ্বয়কে দেখালো এবং আর বিলম্ব না করে সন্ধান চালানোর জন্য প্রস্তুত হলো। নিশ্চয়ই এখানে এই সিন্ধি পর্বতে আটক করে রাখা হয়েছে মিঃ ভৌমের কন্যাকে।

নূর বললো–স্যার, গাড়ির জন্য ভেবে আর সময় নষ্ট না করে আমরা কাজ শুরু করি। এই সিগারেটের টুকরাই প্রমাণ করছে এখানে যে ব্যক্তি রয়েছে সে সাধারণ ব্যক্তি নয়। স্বয়ং দস্যু বনহুর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বললেন মিঃ শংকর রাও–হা ঠিক বলেছেন মিঃ নূর, দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কেউ এমন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে না।

মিঃ হারুন সিগারেটের টুকরাটা নূরের হাত থেকে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন, এবার তিনি বললেন–আমি জানি দস্যু বনহুর এই ধরনের সিগারেট পান করে।

এমন সময় হঠাৎ গাড়ির শব্দ কানে এলো। কোনো মোটরের শব্দ হবে। সবাই তাকালেন দূরে বহুদূরে একটা এলোপাতাড়ি পথের দিকে।

মিঃ শংকর রাও বললেন–তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করে ফেলুন। একটা জীপ গাড়ি এদিকে আসছে।

হাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দূরে নিক্ষেপ করে বললো নূর।

মিঃ হারুন বললেন—-আর এক দন্ডও বিলম্ব করা উচিত নয় লুকিয়ে পড়ুন সবাই।

মিঃ শংকর রাও বললেন–গাড়িখানা কাদের শত্রুপক্ষ না মিত্রপক্ষ বোঝা যাচ্ছে না, কাজেই আত্মগোপন করাই শ্রেয়।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং নূর দ্রুত যেখানে পারলেন আত্মগোপন করলেন।

গাড়িখানার রাশিকৃত ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে। গাড়ির অভ্যন্তরে কয়েকজন লোক দৃষ্টিগোচর হলো। মিঃ হারুনের দল আত্মগোপন করলেও তাদের দৃষ্টি ছিলো গাড়িখানার দিকে।

নূরের হাতে ছিলো দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

নূর স্পষ্ট দেখছে চারজন লোক একজন লোককে ধরে রেখেছে শক্ত করে। একজন লোক ড্রাইভ করছে।

নূর মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন–স্যার, আপনি ওয়্যারলেসে পুলিশ অফিসের হেড কোয়াটারে জানিয়ে দিন কিছু পুলিশ ফোর্সসহ চারটি পুলিশ ভ্যান যেন চলে আসে।

বললেন মিঃ শংকর রাও–হাঁ, চারটা পুলিশ ভ্যানের দরকার, কারণ পর্বতটার চারপাশে ঘিরে ফেলতে হবে।

মিঃ হারুন নূরের কথামত কাজ করলেন।

তিনি ওয়্যারলেসে কান্দাই পুলিশ হেড কোয়ার্টারে সংবাদ পাঠালেন।

মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গীদ্বয় কথা বলছিলেন কিন্তু তাদের চোখ ছিলো দূরে রাশিকৃত ধুলো ছড়িয়ে যে গাড়িখানা সিন্ধি পর্বতের দিকে এগিয়ে আসছিলো সেইদিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িখানা এসে পড়লো একেবারে নিকটে। পর্বতটার নিকটে পৌঁছতেই গাড়ি থামিয়ে ফেললো তারা।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং নূর দেখলো একটা অর্ধবয়স্ক লোককে তারা হাতমুখ বেঁধে টেনে–হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলো।

যে চারজন গাড়িতে ছিলো তাদের চেহারা মোটেই ভদ্র নয়। কেমন যেন গুন্ডা প্রকৃতির ছাপ। পরিলক্ষিত হচ্ছিলো তাদের চেহারায়।

যে লোকটাকে তারা পিছমোড়া করে বেঁধে আনলো তাকে বড় অসহায় লাগছিলো। লোকটার চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান।

লোকটাকে যে তারা হাইজ্যাক করে এনেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুন্ডা–লোক চারজন অসহায় লোকটাকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছিলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নেওয়া হলো তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো পর্বতের দিকে।

নূর সঙ্গীদ্বয়সহ নিপুণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছিলো। তার চোখেমুখে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠেছে। যা হোক সন্ধান তাদের করতে হলো না, আপনা–আপনি সন্ধান পেয়ে যাবে।

ওরা চারজন লোকটাকে নিয়ে একেবারে পর্বতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

একজন গাড়িতে বসে সিগারেট ধরালো।

হাত-পা ছড়িয়ে সিগারেট পান করতে লাগলো লোকটা ড্রাইভ আসনে বসে।

চার ব্যক্তি অসহায় লোকটাকে নিয়ে সিন্ধি পর্বতের একস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে বাঁশিতে ফুঁ দিলো।

অমনি পর্বতের কিছু অংশ দুলে উঠলো।

তারপর বের হলো একটা ফাটল।

লোক চারজন ঐ অসহায় বন্দী লোকটাকে নিয়ে পর্বতের গায়ে ফাটল ধরনের পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

নূর চাপাকণ্ঠে বললো—-ঠিক ঐ স্থানটাতেই আমি সিগারেটের টুকরাটা পেয়েছিলাম।

মিঃ হারুন বললো–বাকা অস্ত্র ঐ বাঁশরী বলে যা ভ্রম হয় ঐ অস্ত্রখানাও আমাদের পুলিশ বাহিনীর একজন ঐ স্থানেই পেয়েছে বলে আমার ধারণা।

হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে। বললো নূর।

ততক্ষণে চারজন লোক বন্দীকে নিয়ে পর্বতটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। তাদের প্রবেশের পর পুনরায় পর্বতের গা ঠিক পূর্বের মত আকার ধারণ করলো।

মিঃ শংকর রাও বললেন–মিঃ নূর, আপনার যাত্রা শুভ। এখানেই বনহুর তার নতুন আস্তানা গেড়েছে এবং অর্থবান ব্যক্তিদের হাইজ্যাক করে এনে নানাভাবে তাদের উৎপীড়ন করছে।

শুধু তাই নয় বন্দীদের উপর উৎপীড়ন করেই বনহুর ক্ষান্ত হচ্ছে না, তাদের আটকে রেখে অর্থ দাবি করে বসেছে! কথাটা বললো নূর।

এরপর নূর সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এলো, ঐ স্থানে এসে দাঁড়ালো তারা। কিন্তু কোনো কিছুই নজরে পড়লো না।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জীপ গাড়িতে বসা লোকটা চিৎকার করতে যাচ্ছিলো কিন্তু নূর তার পূর্বেই ছুটে গিয়ে লোকটাকে চেপে ধরলো এবং দুহাতে গলাটিপে ধরলো শক্ত করে।

লোকটা টু শব্দ করারও সুযোগ পেলো না। নূর ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো গাড়ির নিচে, তারপর বললো–স্যার, আপনারা আসুন, আজ সন্ধান পাওয়া গেলো। পরে কাজ সমাধা করতে হবে।

মিঃ হারুণ বললেন—- ঠিক বলেছেন মিঃ নূর, কারণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এখানে থাকা ঠিক হবে না। এ গাড়িখানা নিয়েই ফিরে যাওয়া যাক।

নূর বললো–এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের গাড়ি ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। পুলিশ ফোর্স সহ পুলিশ ভ্যান আসতে বিলম্ব হবে, কাজেই আজ ফিরে যাওয়াই শ্রেয়।

মিঃ শর্কর রাও বললেন–মিঃ হারুন। আপনি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেন পুলিশ ভ্যানগুলো যেন রওয়ানা না দেয়।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও উঠে বসলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার পূর্বেই জীপ নিয়ে ছুটলো নূর কান্দাই শহরের দিকে।

*

বললো বনহুর–তোমরা ওকে মুক্ত করে দাও বলবে আমি শুনবো।

মুখোশধারী তার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো– বলবো তাই করো। তরুণীর চেয়ার থেকে ইলেকট্রিক সুইচ অফ করে দাও এবং বনহুরকে স্বাক্ষর করিয়ে নাও তার সম্মুখস্থ ফরমে।

বনহুর তাকালো সম্মুখস্থ টেবিলে একটা আশ্চর্য ধরনের ফরম আর বিস্ময়কর কলমটার দিকে।

স্বাক্ষর করলো সে। এ ছাড়া তার কোনো উপায় ছিলো না।

এবার বনহুরকে সেই অদ্ভুত বাক্সে প্রবেশ করার জন্য বলা হলো।

নিশো তখনও তার চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। শুধু ইলেকট্রিক কারেন্ট অফ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

ব্যথিত কাতর চোখে তাকালো নিশো বনহুরের দিকে। রাশিকৃত বেদনা ঝরে পড়ছে তার চোখেমুখে।

বনহুরকে ওরা সেই বিস্ময়কর বাক্স বা খোলটার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ দিলো।

মুক্ত করে দিলো ওরা বনহুরকে তার ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে।

বনহুর বিনা দ্বিধায় খোলসটার মধ্যে প্রবেশ করলো।

খোলসের এক অংশ সংযোগ করা ছিলো জাহাজটার যে ক্যাবিনে তারা এখন উপস্থিত রয়েছে সেই ক্যাবিনের বিশেষ এক অস্ত্র অথবা মেশিনের সঙ্গে।

মুখোশধারী সুইচ টিপতেই সম্মুখস্থ টেলিভিশনের পর্দায় পরিলক্ষিত হলে সমুদ্রগর্ভের প্রতিচ্ছবি।

মুখোশধারী বললো–বনহুর তুমি ভালভাবে দেখে নাও কোন পথে তুমি ঐ ডুবু পর্বতটার ভিতরে প্রবেশ করবে।

বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো মাত্র।

বাক্স অথবা খোলসটার দরজা বা ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেলো।

নিশো আর্তকণ্ঠে কিছু উচ্চারণ করলো।

বনহুর নিশোর কথা আর শুনতে পেলো না।

মুখোশধারী সুইচ টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে খোলস অথবা অদ্ভুত বাক্সটাসহ ক্যাবিনের মেঝেটা নেমে গেলো নিচে।

মুখোশধারী টেলিভিশন পর্দায় চোখ রেখে বসে রইলো চেয়ারে।

নিশোও তার চেয়ারে বসে দেখতে লাগলো।

মুখোশধারীর দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অনুচরবৃন্দ।

অদ্ভুত জাহাজখানা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তখন রাত।

সমুদ্র নীরব।

আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

জমাট অন্ধকার ভরা চারদিক।

সামুদ্রিক বাতাস বইছে।

ক্যাবিনে উজ্জ্বল আলো থাকায় রাত বা দিন বোঝা যাচ্ছে না। মেশিন আর কলকজার মধ্যে বসে আছে মুখোশধারী, নিশো আর অনুচরগণ। সবার দৃষ্টিই রয়েছে টেলিভিশনের পর্দায়।

এবার স্পষ্ট ভেসে উঠলো সমুদ্র তলদেশে অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সেই খোলসটা যার মধ্যে রয়েছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। সম্মুখে তীব্র উজ্জ্বল আলোর ছটা বেরিয়ে সমুদ্রতলদেশকে আলোকিত করে দিচ্ছে।

আলোর ছটাটি বিতরণ করছিলো সেই বাক্স বা খোলসটির অগ্রভাগ। এত জোরালো আলো যার জন্য সমুদ্রতলদেশ স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ নজরে পড়ছিলো।

ঠিক পর্বতটার পাশে গিয়ে থেমে গেলো বাক্সটা।

সঙ্গে সঙ্গে ডালা খুলে গেলো।

বনহুর বেরিয়ে পড়লো।

তার দেহে এক ধরনের হাল্কা আবরণ ছিলো, মুখে অক্সিজেনভরা মুখোশ।

বাক্সটার মধ্যে এ আবরণ ছিলো।

বনহুর যখন বাক্সটার মধ্যে প্রবেশ কলো তখন আস্তে আবরণটা তার দেহকে আচ্ছাদিত করে ফেললো। আক্সিজেনভরা মুখোশ মুখের সঙ্গে সংযোগ হলো। বনহুর সেইভাবে বেরিয়ে এলো, কাজেই সমুদ্রের পানি তার দেহ স্পর্শ করলো না বা তার নিঃশ্বাস নিতেও কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো একটা ডু পর্বত তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

একটি সুড়ঙ্গপথ নজরে পড়লো।

বনহুর বুঝতে পারলে তাকে ঐ পথে প্রবেশ করতে হবে। বাক্সটার মধ্য হতে বেরিয়ে পড়ে সুড়ঙ্গ পথে বনহুর সাঁতার কেটে ঢুকে পড়লো।

সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করার দৃশ্য জাহাজে বসে দেখছে মুখোশধারী ও তার অনুচরগণ।

নিশোও দেখছিলো।

কি ভয়ংকর দৃশ্য, সমুদ্রতলে মানুষ হয়ে ডুবু পর্বতে প্রবেশ–নিশো যেন ভাবতেও পারছে না। সে দুচোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে টেলিভিশন পর্দার দিকে।

বনহুর কভারে আচ্ছাদিত দেহ নিয়ে ভুরু পর্বতটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এগুতে লাগলো। সত্যি তার নিঃশ্বাস নিতে তেমন কোনো কষ্ট হচ্ছে না। যতই ভিতরে প্রবেশ করছে ততই বনহুর আশ্চর্য হচ্ছে, এ এক অদ্ভুত জায়গা।

বনহুরের বাহক বাক্স বা খোলসখানা রয়ে গেছে সুড়ঙ্গমুখের বাইরে। একটা তীব্র আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে তার দেহের পোশাকটার ভিতর থেকে। অবশ্য সার্চ লাইটের মত ঠিক মাথার উপরে রয়েছে আলোর বল।

সমুদ্রের জলরাশি সুড়ঙ্গ মধ্যে থৈ থৈ করছে।

ক্রমান্বয়ে সুড়ঙ্গপথ প্রশস্ত মনে হচ্ছে বনহুরের কাছে। এক বিস্ময়কর রাজ্য।

আরও কিছুটা প্রবেশ করতে বিরাট আকার একটা হাতির গুঁড়ের মত বস্তু বনহুকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে এলো।

বনহুর দ্রুত সাঁতার কেটে সুড়ঙ্গমুখের দিকে এগুলো।

সব লক্ষ্য করছে মুখোশধারী।

বনহুরকে যখন হাতির গুড়ের মত বস্তুটা আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছিলো তখন মুখোশধারীর কণ্ঠ দিয়ে একটা শব্দ বের হলো–সর্বনাশ হলো। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বনহুর যখন দ্রুত বেরিয়ে এলো তখন মুখোশধারীর মুখখানা উজ্জ্বল আনন্দে ভরে উঠলো না। একটা বিরাট হতাশা তাকে গ্রাস করলো যেন।

সব দেখছিলো মুখোশধারী ও তার সঙ্গীরা।

নিশো দুহাতে চোখ ঢেকে ফেলেছিলো।

বনহুর ডুবু পর্বতের সুড়ঙ্গপথ হতে বেরিয়ে আসতেই মুখোশধারী সুইচ টিপলো। অমনি বাক্সটা বনহুরের সম্মুখে এগিয়ে গেলো।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর প্রবেশ করলো তার বাক্স বা খোলসটার মধ্যে।

মুখোশধারী অপর একটা সুইচ টিপতেই বনহুর সহ বাক্স বা খোলসটা সা সা করে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কয়েক মিনিট মাত্র, তারপর টেলিভিশন পর্দায় আর কিছু নজরে পড়ছে না।

এবার মুখোশধারী পা দিয়ে একটা বোতামে চাপ দেয়।

অমনি মেঝের কিছু অংশ ফাঁকা হয়ে ঐ স্থানে ভেসে উঠে সেই বাক্সটা, যার মধ্যে রয়েছে বনহুর!

নিশো ছুটে আসে বাক্সটার পাশে।

ততক্ষণে বাক্সটার ডালা খুলে যায়, বেরিয়ে আসে বনহুর।

এবার বনহুরের দেহে কোনো খোলস বা কভার ছিলো না।

নিশো দুহাত বাড়িয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরে।

অদ্ভুত ভাষায় কিছু বলতে থাকে নিশো।

তার কথার মানে–আর তাকে ঐ সমুদ্র গর্ভে যেতে দেবে না। নিশো এক দৌড়ে চলে গেলো তারপর সেই ব্যাগটা নিয়ে ফিরে এলো।

মুখোশধারীর সামনে ব্যাগটা রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে কিছু বললো নিশো।

বনহুর তার সব কথা বুঝতে না পারলেও এটা সে বুঝতে পারলো, নিশো সব টাকাসহ ব্যাগটা মুখোশধারীকে ফেরত দিয়ে বনহুরের মুক্তি কামনা করছে।

মুখোশধারী নিশোর এ প্রস্তাব উপেক্ষা করলো।

ব্যাগটা কেড়ে নিলো মুখোশধারীর ইঙ্গিত তার একজন অনুচর।

নিশো মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ালো এবং ঝাঁপটে ধরলো ব্যাগ সহ অনুচরটার হাত।

মুখোশধারী পুনরায় ইঙ্গিত করলো।

এবার অনুচরদের একজন নিশোকে ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো।

বনহুর অতিকষ্টে নিজকে সংযত রাখলো।

বনহুরকে মুখোশধারী বললো–তোমাকে আজ রাতেই পুনরায় সমুদ্রতলে অবতরণ করতে হবে। হাতির শুঁড়ের মত যে বস্তুটা তুমি দেখলে সেটা অক্টোপাশ, অতি ভয়ংকর জীব। তোমাকে ঐ জীব হত্যা করবার চেষ্টা করবে। আমি জানি একমাত্র তুমিই ঐ জীবটাকে পরাজিত করে ডুবু পর্বত থেকে মূল্যবার মুক্তার স্তূপ উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হবে।

বনহুরের সুন্দর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

কোনো জবাব দেয় না বনহুর।

মুখোশধারী বুঝতে পারে বনহুর তার জীবন বাজি রেখে সমুদ্রগহ্বর থেকে মুল্যবান মুক্তা উদ্ধার করে আনতে রাজি নয়, তাই সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে।

পুনরায় তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো হলো।

নিশো বাধা দিলো, কিছুতেই সে বনহুরকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে দেবে না।

কিন্তু নিশোর কোনো বাধাই শুনলো না মুখোশধারী।

অনুচরগণ বনহুরকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

বনহুর অসহ্য যন্ত্রণায় মুখখানাকে বিকৃত করে।

নিশো ছুটে যায় বনহুরের দিকে।

কিন্তু তার পূর্বেই নিশোকে ধরে ফেলে এবং দুহাত দুটো খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে মজবুত করে।

তারপর বনহুরকে পুনরায় সেই বাক্সে প্রবেশ করানোর জন্য অনুচরগণ চেষ্টা চালাতে লাগলো।

বেশিক্ষণ বনহুর নিজকে ধরে রাখতে পারলো না। তাকে শিকল দ্বারা বেষ্টন করে সেই খোলসের মধ্যে প্রবেশ করালো। এবার একটা বাঁকা অদ্ভুত ধারালো অস্ত্র দিলো বনহুরের হাতে। অস্ত্রটা বনহুরকে বিস্মিত করলো, ঠিক যেন একটা বাঁশরী।

পাঠকগণ আশ্চর্য হবেন কান্দাই শহরের বিশিষ্ট ধনবান মিঃ ভৌমকে যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এ অস্ত্র ঠিক সেই ধরনের তাতে কোনো ভুল নেই।

তবে কি অজানা অচেনা এই জাহাজখানার সঙ্গে সুদূর কান্দাই শহরের সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরের যোগাযোগ রয়েছে।

এ পৃথিবীতে কিছুই আশ্চর্য নয়।

সবই ঘটতে পারে অথবা ঘটাতে পারে এমন ব্যক্তিও আছে। কাজেই যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে।

বনহুরকে সেই বিস্ময়কর অস্ত্রটা দেওয়া হলো।

আশ্চর্যজনক অস্ত্রখানা হাতে নিয়ে ভাবছে বনহুর। কি ভাবছে সে নিজেই জানে, উল্টে–পাল্টে দেখছে অস্ত্রটা।

মুখোশধারী বললো– অতি মারাত্মক অস্ত্র। এ অস্ত্রটাতে এমন ধার রয়েছে যার একটু ছোঁয়া লাগলে কোনো প্রাণী জীবিত থাকতে পারবে না। বনহুর, আমি জানি তুমি এই অস্ত্র দ্বারা সমুদ্রতলে ডুবু পর্বতের সুড়ঙ্গে যে ভয়ংকর অক্টোপাশের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলো তাকে নিহত করতে সক্ষম হবে।

মুখোশধারীর চোখ দুটোর দিকে তাকালে বনহুর।

নিশো নিজের ভাষায় বলে উঠলো–তোমাকে আমি আর ঐ বিপদের মুখে যেতে দেব না। না না যেতে দেবো না।

কিন্তু নিশোর আর্তনাদ কেউ গ্রাহ্য করলো না।

বনহুর শুধু শান্ত ধীর দৃষ্টি মেলে তাকালো নিশোর দিকে।

নিশোর হাতখানা তখন শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। একমাত্র আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিলো না। নিশো চেয়েছিলো নিজের জীবন দিয়ে বনহুরকে বাঁচাতে কিন্তু সে তাকে ঐ মুহূর্তে ধরে রাখতে পারলো না। কুচক্রীদল বনহুরকে পুনরায় সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করলো।

শুধু সুইচ টিপলো অমনি মেঝেটা নেমে গেলো নিচে। বনহুরসহ বাক্সটা অদৃশ্য হলো।

মুখোশধারী এবার সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো সমুদ্রগর্ভের প্রতিচ্ছবি।

একটু পরেই পরিলক্ষিত হলো বনহুরসহ সেই বাক্সটা। একটা জলযানের মত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ডুবু পর্বতটার দিকে। তীব্র উজ্জ্বল আলোর ছটায় আলোকিত হয়ে উঠেছে সমুদ্র তলদেশ।

মুখোশধারীর বিস্ময়কর জাহাজখানা থেকেই আলোকরশ্মি ছড়ানো হচ্ছে সমুদ্রতলে। সামান্য ক্ষুদ্রতর ঝিনুক অথবা সমুদ্র তলদেশের বাহনখানা স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

নিশোও তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের পর্দার দিকে।

মুখোশধারী এবং তার অনুচরগণ দেখছে।

ভারী আশ্চর্যজনক এ দৃশ্য।

মুখোশধারী অথবা তার অনুচরদের কাছে এ ঘটনা বিস্ময়কর নয়। কারণ ইতিপূর্বে বহুবার মুখোশধারী বিভিন্ন ব্যক্তিকে সমুদ্রতলে পাঠিয়েছে মহামূল্যবান মুক্তা সংগ্রহে। কিন্তু সফলকাম হয়নি। যাকে সমুদ্রতলে পাঠানো হয়েছে সে আর ফিরে আসেনি। ডুবু পর্বতের গহ্বরে প্রবেশ করার পর আর বের হতে পারেনি তারা। ভয়ংকর অক্টোপাশের কবল থেকে রক্ষা পায়নি কেউ।

দীর্ঘদিন ধরে মুখোশধারী সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে।

সমুদ্রতলে ডুবুপর্বতের সন্ধান সে পেয়েছিলো কোনো এক ডুবুরীর নিকট থেকে। একটা ম্যাপ সে পেয়েছিলো তারই কাছে। ঐ ম্যাপ ধরে মুখোশধারী সমুদ্রতলে সন্ধান চালিয়ে চলেছে বহু দিন ধরে এবং সে এই জাহাজ তৈরি করে নিয়েছে অতি কৌশলে।

জাহাজের বাইরের রূপ আশ্চর্যজনক হলেও কেউ তেমন কিছু মনে করতো না কিন্তু জাহাজটার ভিতরের রূপ ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। গোটা জাহাজটিই ছিলো কলকব্জা আর মেশিনের দ্বারা ভর্তি। এক কথায় বলা যায়, গোটা জাহাজটাই একটা বিস্ময়কর মেশিন। জাহাজের তলদেশে ছিলো তীব্র সার্চ লাইট, যার সুইচ টিপলেই সমস্ত সমুদ্রতল আয়নার মত স্পষ্ট দেখা যেতো। তলদেশে ছিলো ক্যামেরা, টেলিভিশনে ক্যামেরা এবং শব্দগ্রহণ যন্ত্র। মুখোশধারী কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এ জাহাজ বানিয়েছিলো। শুধু মাত্র সাগরতলের মুক্তা সংগ্রহই তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো না। তার আরও কিছু কু–ব্যবসা ছিলো যা থেকে প্রতিদিন আসতো লক্ষ লক্ষ টাকা।

সব কাজ তার জাহাজে বসেই হলো।

জাহাজের অভ্যন্তরে নানা ধরনের মেশিন রয়েছে। এক একটা মেশিনে এক একটা কাজ সমাধা হয়। দূরদেশ গুলোতেও রয়েছে তার অনুচর এবং দলবল। যারা তার নির্দেশমত কাজ করে যাচ্ছে।

এমন কি সুদূর কান্দাইয়ে তার অনুচর বা দলবল কাজ করছে। তারা দীর্ঘ সময় ধরে কান্দাইয়ের নানা স্থানে হাইজ্যাক, চোরাচালানী এবং রাহাজানি করে চলেছে কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, তাই তেমন কেউ জানে না তাদের সন্ধান। মুখোশধারী নিজকে সব সময় গোপন রেখেছে। আজও সে নিজ অনুচরদের কাছে পরিচিত নয়।

মুখোশধারী মুখোশের অন্তরালে থেকেই কঠিনভাবে তার কাজ সমাধা করে চলেছে। কোনো অনুচর আজও তাকে চোখে দেখেনি বা দেখলে চিনতে পারবে না।

মুখোশধারী সমুদ্রতলে মুক্তার সন্ধান পাওয়ার পর উন্মাদ হয়ে উঠে তারপর ডুবুরী দ্বারা নানাভাবে মুক্তা সংগ্রহের চেষ্টা চালায় কিন্তু সকাম হয় না।

সফলকাম না হলেও মুখোশধারী পিছপ হয় না, সে নতুনভাবে চেষ্টা চালায়। সমস্ত পৃথিবী যে এক রকম চষে ফেলে কে তার এই দুর্গম কাজ সমাধা করতে সক্ষম হবে। বহু ডুবুরী প্রাণ দিলো অর্থের লোভে। বহু ডুবুরীকে জোরপূর্বক ধরে আনা হলো তাদেরকে পাঠানো হলো ডুবু পর্বতটার ভিতরে কিন্তু কেউ ফিরে এলো না।

সমুদ্রতলে ডুবু পর্বতে মূল্যবান মুক্তার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা উদ্ধারের চেষ্টা সবাই করতে পারে না। এ রাজ্য ছিলো মাংঙ্গে রাজের? মাংঙ্গো রাজকে রাজি করিয়েই মুখোশধারী কাজে নেমেছিলো। তাই স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিলো। মুখোশধারী জানতো যারাই মুক্তা সংগ্রহে অবতরণ করছে তারাই স্ব–ইচ্ছায় যাচ্ছে। কাউকে সে জোরপূর্বক পাঠায়নি।

স্বাক্ষরযুক্ত কাগজখানা দেখলেই মাংঙ্গোরাজ সন্তুষ্ট কারণ স্ব–ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলে তার তেমন কোনো দুঃখ নেই, বলবারও কিছু থাকে না। মুখোশধারী তাই এ পথ বেছে নিয়েছে মাংগোরাজকে খুশি করার জন্য।

ডুবুরীর সন্ধান কেমন করে মুখোশধারী পেলো তা সত্যিই বিস্ময়কর বটে।

মুখোশধারীর ব্যবস্থা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র বলা যায়। কোনো এক অনুচর ডুবুরীর সন্ধান মুখোশধারীকে বলে দেয়। শুধু সে ডুবুরীর কথাই বলে না তার গোপন ম্যাপখানার কথাও বলে।

মুখোশধারীর চোখ দুটো সেদিন মুখোশের অন্তরালে জ্বলে উঠে, সে অনুচরটাকে আদেশ দেয় ডুবুরিটাকে তার নিকটে হাজির করতে।

অনুচরটা বন্ধুর রূপ নিয়ে ডুবুরির পাশে যায় এবং তাকে নানা মিথ্যার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে আসে, তার মুখেই ম্যাপ ও সেই ডুবু পর্বতের অভ্যন্তরে মহামূল্যবান মুক্তার সন্ধান জেনে নেয় মুখোশধারী।

তারপর মুখোশধারী বৃদ্ধ ডুবুরিটাকে হত্যা করে নির্মমভাবে। শুধু ডুবুরিকেই হত্যা করে না মুখোশধারী হত্যা করে তার নিজের অনুচরটাকেও। কারণ সে ম্যাপ ও ডুবুরির সব কথা জেনে নিয়েছিলো।

মুখোশধারী পৃথিবী থেকে ডুবুরিকে সরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়েছিলো তার নিজের অনুচরটাকে যে অনুচরটা তাকে সমুদ্রগর্ভে মুক্তার সন্ধানের কথা জানিয়েছিলো।

এর কারণ আছে বা ছিলো, কারণ হলো একদিন হয়তো ঐ অনুচরটা তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যাবে। হয়তো লোভ হবে, মুক্তাগুলো তো তারই প্রাপ্য। তাই মুখোশধারী বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

কিন্তু সব গুছিয়ে এনেও মুখোশধারী যখন হতাশ হলো পরপর অনেকেই যখন মুক্তা সংগ্রহে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলো। ফিরে যখন কেউ এলো না তখন চোখে ঘোলাটে দেখলো মুখোশধারী। সে নতুনভাবে লোকের সন্ধান চালালো, যে তার এই স্বাভাবিক কাজ সমাধা করতে পারবে।

কান্দাই থেকে এক অনুচর জানালো তাদের মুক্তা সংগ্রহ সহজ হবে যদি তারা একজনকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলো সেদিন মুখোশধারী। দস্যু বনহুরের নাম সে শুনেছিলো তবে তেমন করে গ্রাহ্য করেনি। একটা দস্যুকে সে কমই কেয়ার করে। কারণ তার নিজের আয় কোনো দস্যু থেকে কম নয়।

পৃথিবীর সর্বগ্র স্মাগলিং চলছে। শুধু তাই নয় হাইজ্যাক করা তার দলের সর্ববৃহৎ কাজ।

কোনো ধনবান ব্যক্তির সন্তান আটক করে তার পিতামাতার নিকট হতে প্রচুর অর্থ দাবি করা তাদের প্রধান কাজ। এতে আসে লক্ষ লক্ষ টাকা, কাজেই মুখোশধারী কাউকে কেয়ার করে না।

সে জানে তার সমকক্ষ বুঝি আর কেউ নেই।

দস্যু বনহুর তার কাছে নগণ্য।

ইচ্ছা করলেই তাকে পাওয়া যাবে।

মুখোশধারী হুকুম করলো দস্যু বনহুরকে আটক করে নিয়ে আসার জন্য।

মুখোশধারী দস্যু বনহুরকে আটক করে আনা যত সহজ মনে করেছিলো তত সহজ নয় পরে বুঝতে পারলো, যখন দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেও বনহুরের কোনো হদিস খুঁজে পেলো না।

প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলো এবং সে দুকোটি টাকা অনুচরদের মধ্যে ঘোষণা করেছিলো যে দস্যু বনহুরকে এনে দিতে পারবে তাকে বা সেই দলকে দুকোটি টাকা দেবে।

একদিন তার সে আশা পূর্ণ হলো।

বনহুরকে পেলো সে হাতের মুঠায়।

এত সহজে পেলো যা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

এ ছাড়াও দু কোটি টাকা তার হাতছাড়া হয়েও হলো না। আবার তার ভাগ্যে এসে গেলো আলগোছে।

মুখোশধারীর আনন্দের অন্ত নেই।

লাকী ম্যান সে।

নিজকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করতে লাগলো।

বনহুরকে পুনরায় সমুদ্রগর্তে পাঠিয়ে বিপুল উন্মাদনা নিয়ে দেখছে। কিভাবে বনহুরকে বহন করে যানটা এগিয়ে যাচ্ছে ডুবু জাহাজটার দিকে।

শুধু মুখোশধারীই নয়, তার অনুচরদের চোখেমুখেও উন্মাদনা তারা বিপুল উৎসাহ নিয়ে দেখছে।

নিশো বড় অসহায়।

তার হাত দুখানা বাধা।

সে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দার দিকে।

বনহুরসহ যানটা গিয়ে থেমে পড়লো ডুবু পর্বতটার ধারে। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপলো মুখোশধারী জাহাজে বসে।

খুলে গেলো বাক্স বা যানটার ঢাকনা।

বনহুর বেরিয়ে পড়লো।

তার দেহে বিস্ময়কর পোশাকটা রয়েছে।

হাতে সেই ধারালো বাঁশরী ধরনের অস্ত্র।

নিশো স্তব্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছে।

বনহুর সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো।

তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিভাবে বনহুর ডুবুপর্বতটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সাঁতার কেটে এগুচ্ছে।

নিশোর ভয় আবার সেই জলজীবটা আক্রমণ করে না বসে। সে তার দেবতাকে স্মরণ করছে মনে মনে। সরলপ্রাণ নিশো ভালবেসে ফেলে বনহুরকে। বনহুরের পৌরষদীপ্ত চেহারা, সুন্দর চোখ দুটো তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিলো। আরও সে

বেশি মুগ্ধ বনহুরের আচরণে। তার মধুর ব্যবহার নিশোর মনে অভূতপূর্ব এক অনুভূতি এনে দিয়েছে। এ ছাড়াও নিশো জানে লোকটা বড় অসহায়। কেউ তার নেই, সে বড় একা।

নারী মন বড় কোমল।

তাই হয়ত নিশো বাঁধা পড়ে গেছে বনহুরের কাছে।

নিশোর ভয়, বনহুর যদি ফিরে না আসে। একটা অমঙ্গল চিন্তা তাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলেছে। বনহুর ডুবু পর্বতটার অভ্যন্তরে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাই দেখছে নিশো আর মানেপ্রাণে জয় কামনা করছে।

টেলিভিশন পর্দায় হঠাৎ ঝকঝক করে উঠলো রাশিকৃত ছোট বড় নানা ধরনের গোলাকার

মুখোশধারী ও তার অনুচর যারা পাশে দন্ডায়মান ছিলো তারাও আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

বনহুরের পরিহিত খোলসের সঙ্গে যে ক্যামেরা ছিলো সেই ক্যামেরা এখন কাজ করছে। সমুদ্রের গভীর তলদেশেই শুধু নয়, ডুবু পর্বতের অভ্যন্তর থেকে ছবি পাঠাচ্ছে। স্পষ্ট সব পরিলক্ষিত হচ্ছে টেলিভিশন পর্দায়।

বনহুর বাঁকা অস্ত্রখানা খোলসের মধ্যে রেখে একটা থলের মধ্যে মুক্তাগুলো তুলে রাখতে লাগলো। থলেটা প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে।

মুখোশধারীর চোখ দুটো মুখোশের মধ্যে আনন্দউচ্ছ্বাসে জ্বলছে।

আনন্দধ্বনি করছে মাঝে মাঝে।

তার অনুচরদের মুখেও খুশি আর আনন্দ।

তবে যতক্ষণ না বনহুর ফিরে এসেছে এবং মুক্তার থলে যতক্ষণ মুখোশধারী হাতের মুঠায় না পেয়েছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গুণছে মুখোশধারী।

বনহুর থলেটা পূর্ণ করে নিলো, তারপর খোলসের মধ্যে ভরে ফেললো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে পাশের গহ্বর থেকে বিরাট বাহুর মত অসংখ্য বাহু প্রসারিত করে বেরিয়ে এলো ভয়ংকর অক্টোপাশটা।

নিশো আর্তচিৎকার করে চোখ বন্ধ করলো।

মুখোশধারীর মুখখানা বোধ হয় মুখোশের মধ্যে ভয়ে উৎকণ্ঠায় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

দস্যু বনহুরের প্রতি সহানুভূতি বা দয়ায় নয় তার সব প্রচেষ্টা বুঝি এবার ব্যর্থ হয় এ কারণে মুক্তাগুলো হাতে পেয়েও যেন সে হারাতে যাচ্ছে।

অক্টোপাশের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড় মুস্কিল তা জানে মুখোশধারী, আর জানে বলেই সে অদ্ভুত বিষাক্ত অস্ত্রখানা বনহুরকে দিয়েছে।

অস্ত্রখানা বনহুর বের করে নিয়েছে।

অক্টোপাশ আক্রমণ করতেই বনহুর অস্ত্র বাগিয়ে ধরলো। কিন্তু অক্টোপাশের বাহুগুলো তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে, একটুও সে হাত নাড়াতে পারছে না। হঠাৎ পেছন থেকে আক্রমণ করায় বনহুর ঠিকমত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারছে না।

নিশো ধীরে ধীরে চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পুনরায় সে চোখ ঢেকে ফেললো। সে বুঝতে পারলো এবার ও কিছুতেই ফিরে আসবে না।

বনহুর তখন ভীষণভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

ভাগ্যিস তার মুখের অক্সিজেন পাইপটা খসে যায়নি তাই রক্ষা।

সাঁতার কাটছে বনহুর।

একদিকে গভীর জলরাশি।

তারপর প্রবল স্রোত সুড়ঙ্গমধ্যে।

অক্টোপাশ এমন কঠিনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যার জন্য বনহুরের এক চুল নড়বার যো নাই।

বনহুরের দক্ষিণ হস্তে ধারালো অস্ত্র।

অক্টোপাশ বনহুরের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে ফেলেছে। বনহুর বহু চেষ্টা করছে নিজকে মুক্ত করার জন্য।

মুখোশধারী আসন ত্যাগ করে দ্রুত ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করছে। এই বুঝি বনহুরকে অক্টোপাশ হত্যা করে ফেলে। এই বুঝি মুক্তার থলেটা হাত ছাড়া হয়ে যায়।

মুখোশধারী পায়চারী করলেও তার দৃষ্টি ছিলো টেলিভিশন পর্দায়।

অনুচরগণও তেমনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে লম্ফ ঝম্ফ করে নানা ধরনের উক্তি উচ্চারণ করছে।

নিশোর মুখ ম্লান আতঙ্কগ্রস্থ।

আর বুঝি নিশো ওকে ফিরে পাবে না। ওর করুণ কান্নায় ভরে উঠলো ক্যাবিনটা।

হয়তো দয়াময়ের ইচ্ছা।

বনহুর তার দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছে। অস্ত্রখানা গভীর পানির তলায় চক চক্ করে উঠছে বার বার।

এবার বনহুর অস্ত্রখানা সমূলে অক্টোপাশের একটি বাহুতে বসিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

অস্ত্রটাতে মারাত্মক বিষ পুশ করেছিলো।

অক্টোপাশের রক্তে মিশে গেলো মারাত্মক বিষের কিছুটা।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে অক্টোপাশের বাহুগুলো শিথীল হয়ে এলো।

যন্ত্রণায় ছটফট করছে অক্টোপাশটা।

বনহুর অস্ত্রসহ হাতখানা প্রবেশ করিয়ে নিলো নিজের খোলসটার মধ্যে।

মুক্ত হলো বনহুর।

নিশোর মুখমন্ডল আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠলো। হাত দুখানা তার মুক্ত থাকলে ধৈ ধৈ করে নাচতো সে মনের খুশিতে।

মুখোশধারীও আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

তাকালো সে অনুচরদের মুখের দিকে।

দৃষ্টি বিনিময় হলো।

কিন্তু অনুচররা ঐ মুখোশের নিচের মুখ জানেনা কেমন।

মুখোশধারী সুইচ টিপলো সঙ্গে সঙ্গে বনহুরসহ যানবাহনটা এগিয়ে আসতে লাগলো জাহাজটার দিকে।

জাহাজখানা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে তখন।

কিছুক্ষণের মধ্যে যানসহ বনহুরকে তুলে নেওয়া হলো। মেঝের একটা অংশ সরে গেলো, সেই স্থানে এসে পড়লো বনহুরসহ যানটা।

সুইচ টিপতেই ঢাকনা খুলে গেলো।

বনহুর বেরিয়ে এলো বাক্স অর্থাৎ বাহনটার ভিতর থেকে খোলসটা আপনা আপনি বনহুরের শরীর থেকে খসে গেছে বাক্সটার ভেতর থেকে বের হবার পূর্বেই।

ওটা মুখোশধারীর চাবিকাঠির মধ্যেই ছিলো সীমাবদ্ধ। তাই সুইচ টিপেই মুখোশধারী কাজ সমাধা করে নিচ্ছিলো।

বনহুর বাহন থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা সংগৃহীত থলেটা মুখোশধারী তুলে নিলো হাতে। দুচোখে তার উচ্ছল আনন্দ ঝরে পড়ছে,

উল্লাসভরা কণ্ঠে বললোক আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেছি– এবার যাও বনহুর, তোমার ক্যাবিনে যাও।

অবাক দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুর মুখোশধারীর মুখের দিকে। মুখ তার আবরণে ঢাকা থাকলেও চোখ দুটো যে নরপশুতত্ত্বে ভরা স্পষ্ট ভাব নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুজন লোক বনহুরকে নিয়ে চললো অপর একটা ক্যাবিনে।

যাবার সময় বনহুর একবার নিশোর দিকে তাকালো।

নিশোর চোখেমুখে অসহায় চাহনি।

বড় মায়া হলো বনহুরের।

কিন্তু কিছুই করবার নেই।

বনহুরকে নিয়ে ওরা অপর এক ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

ক্যাবিনটার কোনো জানালা বা শার্শী নেই।

একটা চেয়ার এবং একটা টেবিল রয়েছে।

লোক দুজন বনহুরকে নিয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করে তাকে ধাক্কা দিয়ে চেয়ারটার উপর ফেলে। দিলো।

বনহুরের হাত দুখানা মুক্ত ছিলো।

সে পড়ে না গিয়ে ধরে ফেললো চেয়ারটার হাতল।

লোক দুজন যেমনি বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো, অমনি বনহুর পেছন থেকে ধরে ফেললো লোক দুজনের ঘাড়ে।

টু শব্দ করবার পূর্বেই দুহাতে দুজনার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে ফেললো।

বনহুরের খাবার কাছে পরাজয় বরণ করলো নরপশুদ্বয়। বনহুর দ্রুত একজনের দেহ থেকে পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে পরে নিলো।

অনুচরদ্বয় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো কিন্তু মৃত্যুবরণ করেনি। বনহুর ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করেই অনুচরটার পরিধেয় বস্ত্র খুলে নিয়ে পরে ফেললো, তারপর ক্যাবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো ওদিকে কেউ নেই।

একেবারে ফাঁকা।

বনহুর দ্রুতহস্তে অনুচরদ্বয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ ফেলে দিলো সমুদ্রগর্ভে।

এবার সে ফিরে এলো নিশো যে ক্যাবিনে আটক ছিলো সেই ক্যাবিনে। ক্যাবিনের দরজায় পা রাখতেই বললো মুখোশধারী, ওকে ভাল করে আটকে রেখেছে দারাশিকো?

দারাশিকোবেশি বনহুর মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

বললো মুখোশধারী–ঐ মেয়েটার হাতের বাঁধন এবার খুলে দাও।

মুখোশধারী কথা বলছিলো কিন্তু তার চোখ ছিলো ঝকঝকে মুক্তার স্কুপের দিকে। থলে থেকে মুক্তাগুলো টেবিলে ঢেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলো সে, অন্য কোনো দিকে তার খেয়াল ছিলো না।

বনহুর মুখোশধারীর অনুচরদের পোশাকে সজ্জিত হলেও তাকে ভালভাবে একটু লক্ষ্য করলেই টের পেয়ে যেতো, কিন্তু বনহুর অতি সাবধানে নিজকে গোপন করে রাখার চেষ্টা করলো।

মুখটা বনহুর ফিরিয়ে রেখেছিলো এবং সেভাবেই সে নিশোর হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিলো।

নিশোও বুঝতে পারেনি।

সেও বনহুরকে মুখোশধারীর অনুচর মনে করেছিলো। তাই হাতের বাঁধন মুক্ত হলেও নিশো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

মুখোশধারী বললো–জংলী জেয়ে, তুমি আর তোমার বন্ধুকে পাবে না। দারাশিকো?

বলেন মালিক। বললো বনহুর।

অবশ্য গলাটার সুর পাল্টাতে বনহুরকে একটু বেগ পেতে হলো।

মুখোশধারী বললো–শোন দারাশিকো, ঐ ক্যাবিনে বন্দীকে আটকে রেখে দাও, তারপর কিছু খেতে দিও। তারপর যখন সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে তখন সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করবে ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা। মনে রেখো, খাবারের সঙ্গে ক্লোরফরমের মাত্রা বেশি করে দেবে। বনহুর সাধারণ ব্যক্তি নয়, সে অত্যন্ত শক্তিবান পুরুষ। দেখলে তো কেমনভাবে সে অসাধ্য সাধন করলো?

হাঁ মালিক দেখলাম।

যাও, এবার জংলী মেয়েটাকে আমার বিশ্রাম ক্যাবিনে নিয়ে যাও। আমি মুক্তাগুলোকে যত্ন করে রেখে আসি। দারাশিকো, জানো না আজ আমি কত খুশি...একটু থেমে বললো মুখোশধারী–বনহুরকে খতম না করা পর্যন্ত আমি একেবারে নিশ্চিন্ত নই।

যাবো মালিক

হাঁ যাও।

মুখোশধারী অনুচরের ছদ্মবেশে বনহুর নিশোর হাত মুঠায় চেপে ধরলো।

নিশো চিৎকার করে নিজকে ওর হাতের মুঠা থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু নিশোর কি ক্ষমতা যে সে বনহুরের হাতের মুঠা থেকে পালায়।

নিশোকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো দারাশিকোবেশী বনহুর।

নিশোর আর্তচিৎকার এক সময় থেমে গেলো।

নির্দিষ্ট ক্যাবিনে নিশোকে নিয়ে বনহুর গিয়ে শক্ত করে ধরে রাখলো, তারপর নিজের গালপাট্টা খুলে ফেললো।

নিশো বনহুরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আনন্দধ্বনি করে মুখ লুকালো বনহুরের বুকে।

এমন সময় ক্যাবিনের বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেলো।

বনহুর দ্রুত জড়িয়ে নিলো গালপাট্টাখানা মুখের নিচের অংশটুকু ভালভাবে ঢেকে ফেললো সে ভালভাবে।

ততক্ষণে মুখোশধারী সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করেছে।

পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে বনহুর হঠাৎ পেছন থেকে আক্রমণ করলো মুখোশধারীকে।

আচমকা আক্রমণ।

মুখোশধারী মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, সে ভাবতেও পারেনি তারই অনুচর তাকে আক্রমণ করে বসবে।

মুখোশধারী নিজকে উদ্ধারের চেষ্টা করলো। তার জামার মধ্যেই রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র। কোনোক্রমে বের করতে পারলেই হলো।

কিন্তু সে সুযোগ দিলো না বনহুর মুখোশধারীকে।

চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

মুখোশ খুলে গেলো মুখোশধারীর।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো–ভাস্কর মাইথি তুমি। তুমি জীবিত আছো।

হাঁ আমি। আমাকে তুমি মৃত মনে করেছিলে বনহুর। কান্দাই শহর থেকে পালিয়ে এলেও আমার দল এখন কান্দাইয়ে কোনো এক গোপন স্থানে আস্তানা গেড়ে আছে। যা তুমি নিজেও জানো না।

বনহুরের হাতের মুঠায় ভাস্কর মাইথির জামার কলার। টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয় বনহুর

ভাস্কর মাইথির নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বললো বনহুর–তুমি আমার যে ক্ষতি সাধন করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে পেতেই হবে।

ওর গলা টিপে ধরলো বনহুর।

ভাস্কর মাইথি বনহুরের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য কঠিনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে চললো। আবার সে মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালালো।

কিন্তু বনহুরের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তার মুস্কিল। ভাস্কর মাইথি একবার মরেছিলো, আর সে মরতে চায় না।

অবশ্য আরও এক ভাস্কর মাইথি ছিলো যে মৃত্যুবরণ করেছিলো সত্যিকার ভাবে, এ ভাস্কর মাইথি দ্বিতীয় ব্যক্তি যার কথা অনেকেই জানে না। এমনকি কান্দাইবাসীরাও জানতো না। অত্যন্ত গোপনে এই এক নম্বর ভাস্কর মাইথি কান্দাই শহরে এবং আরও বিভিন্ন দেশে কুকর্ম চালিয়ে চলেছিলো।

বনহুর এই নরপশুকে হাতের মুঠায় পেয়েছিলো। কিন্তু তখন বনহুর ছিলো তরুণ! ভাস্কর মাইথির বয়সও খুব বেশি ছিলো না, তাই সেদিন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলো।

ভাস্কর মাইথি সেদিন দেশত্যাগ করলেও গোপনে সে আবার ফিরে গিয়েছিলো কান্দাই। নানা কুকর্ম চালিয়ে চলেছিলো সে।

দীর্ঘ সময় ধরে ভাস্কর মাইথি আত্মগোপন করে থাকলেও একদিন সে বনহুরের দলের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলো এবং তাকে পাকড়াও করে আনার সময় সে নীলনদে আত্মবিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো।

আসলে সে সেদিন মৃত্যুবরণ করে নি।

মন্দ জিনিসের ক্ষয় সহজে হয় না।

যেমন কচুরিপানাকে ধ্বংস করে ফেলতে চাইলেই সহজে তা বিনষ্ট হয় না। তেমনি ভাস্কর মাইথি সেদিন নীলনদে ঝাঁপিয়ে পড়লেও জীবনে বেঁচে যায়। কচুরিপানার মতই সে ভেসে ভেসে তীরে গিয়ে উঠে এবং আবার সে তার দলবল নিয়ে গোপনে কুকর্ম করে চলে। নিজে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায়, একেবারে কান্দাই শহর থেকে লাখো লাখো মাইল দূরে।

বনহুর জানলো ভাস্কর মাইথি মরে গেছে, সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্তও গ্রহণ করেছে। বনহুর ভাস্কর মাইথিকে একরকম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো।

ভাস্কর মাইথিও দূরে সরে গিয়ে বনহুরকে একরকম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। সাগরতলে মুক্তার সন্ধানে গিয়ে দীর্ঘ সময় পর আবার বনহুরের নাম এলো তার হাতের মুঠায়।

আজ বনহুর দীর্ঘ সময় পর হলেও সেই ভাস্কর মাইথিকে চিনতে ভুল করে না। ওর মুখোশ খুলে যেতেই বনহুর ওকে চিনে ফেলে।

দীর্ঘদিনের রাগ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো বনহুরের মনে, তার সঙ্গে আজকের কথাও বনহুরকে ক্রোধান্বিত করে তুললো।

বনহুর ভাস্কর মাইথির গলায় চাপ দিলো আরও জোরে।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে বনহুরের।

বললো বনহুর–আজ তোমাকে জীবিত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করবে না। তোমাকে হত্যা করে তারপর নিক্ষেপ করবো সমুদ্রগর্ভে।

ভাস্কর মাইথির চোখের সামনে সর্ষেফুলের মত সমুদ্রতল থেকে থলেভরা তুলে আনা মুক্তাগুলো ঐ মুহূর্তে ভেসে উঠলো।

বনহুর ভাস্কর মাইথিকে মাটিতে ফেলে দিলো। কিছুক্ষণ পূর্বেও তাকে চরম শাস্তি দিয়ে সমুদ্রতলে পাঠিয়েছিলো, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বনহুর মুক্তাগুলো তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিলো। বনহুরের শারীরিক যে কষ্ট হয়েছিলো তা কল্পনাতীত। শুধু নরপশু বনহুরকেই কষ্ট দেয়নি, একটা অসহায় মেয়েকে সে যেভাবে কষ্ট দিয়েছে তা কল্পনা করা যায় না।

মেঝেতে ফেলে দিয়ে ভাস্কর মাইথির গলায় পা দিয়ে এমনভাবে চাপ দিলে বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর মাইথির জিভ বেরিয়ে এলো, তার সঙ্গে চিবুক বেয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

বনহুর যখন ভাস্কর মাইথিকে পায়ের চাপে হত্যা করলো তখন নিশো ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার চোখ দুটো ভীত আতঙ্কিত একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর যখন ভাস্কর মাইথিকে হত্যা করে ফিরে তাকালো নিশোর দিকে তখন নিশো ভীতভাবে পালিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

বনহুর ডাকলো–নিশো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নিশো, আতঙ্কতরা চোখে তাকালো ক্যাবিনের মেঝেতে পড়ে থাকা ভাস্কর মাইথির মৃতদেহের দিকে, তারপর বনহুরের দিকে।

বনহুর তখন স্বাভাবিকভাবে তাকালো নিশোর দিকে। দুহাত প্রসারিত করে ডাকলো বনহুর ওকে।

নিশো আর নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, সে ছুটে গিয়ে বনহুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এমন সময় ভীষণ চেহারার লোকটাসহ দুজন অনুচর সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করেই তাদের মালিকের চরম অবস্থা লক্ষ্য করে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

মাত্র কয়েক মিনিট তারা তাকালো মেঝেতে শায়িত মালিকের নিশ্চুপ দেহটার দিকে।

ওরা মালিকের মুখ কোনোদিন দেখেনি তাই প্রথমে চিনতে পারে না কিন্তু তার দেহের পোশাক এবং পাশেই অনতিদূরে নিক্ষিপ্ত পরিচিত মুখোশটা তাদের চেনাতে সক্ষম হয়। মালিককে চিনতে তাদের ভুল হয় না।

অনুচর দুজন বিশালদেহী শক্তিশালী ব্যক্তিটাকে ইংগিত করে বনহুর ও নিশোকে আক্রমণ করতে।

বনহুর বুঝতে পারে, মুহূর্তে সে সাবধান হয়ে যায়। সে লক্ষ্য করে অনুচরদের একজনের হাতে সেই ধারালো অস্ত্র, যে অস্ত্র নিয়ে বনহুর সমুদ্রগর্ভে ডুবু পর্বতের

দুর্গম সুড়ঙ্গমধ্যে ভয়ংকর জীব অক্টোপাশটার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

অস্ত্রটা বনহুরকে এই মুহূর্তে আশান্বিত করে।

বিরাটদেহী লোকটাকে যখন অনুচরদ্বয় নির্দেশ দিচ্ছিলো তখন বনহুর কিন্তু ভাবছিলো ঐ অস্ত্রটার কথা। এই মুহূর্তে ঐ অস্ত্রটা তার একান্ত প্রয়োজন।

ঐ অস্ত্র দ্বারা সে নিজকে রক্ষা করতে পারবে এবং নিশোকেও সে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

বনহুর একদন্ড বিলম্ব না করে সম্মুখস্থ টেবিলটা উল্টে দিলো অনুচরটার দিকে।

অনুচরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো এবং তার হাতের সেই মারাত্মক অস্ত্রটা ছিটকে পড়লো কয়েক হাত দূরে।

বনহুর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো অস্ত্রটা হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। বিরাটদেহী অসীম শক্তির অধিকারী লোকটা ছুটে পালিয়ে গেলো।

অনুচরদ্বয়ের মুখেও রক্তশূন্যতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো। তারা ফ্যাকাশে মুখে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর বললো–তোমরা মরতে চাও না বাঁচতে চাও? যদি এই অস্ত্র থেকে রেহাই পেতে চাও তবে আমি যা বলবো শুনতে হবে।

উভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

তারপর একজন বললো–আমাদের মালিক মৃত্যুবরণ করেছে, কাজেই আমরা এখন তোমার চাকর। যা বলবে তাই শুনবো এবং করবো।

এই অস্ত্রের ভয়ে না আমার দৈহিক শক্তির ভয়ে?

অনুচরদ্বয় তাকালো বনহুরের হস্তস্থিত অস্ত্রটার দিকে।

বনহুর বললো–বলতে আর হবে না আমি বুঝতে পেরেছি। যাও তোমরা নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যাও এবং জাহাজখানাকে পুনরায় সেই বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ক্যাপটেনকে বলে দাও। যেখানে আছে নিশোর বাবা এবং তার লোকজন।

অনুচরদ্বয় মুখ চুন করে ফিরে গেলো।

যাবার পূর্বে বনহুর বলে দিলো–খবরদার, কোনোরকম চালাকি করতে যেও না, তাহলে মারা পড়বে।

ওরা কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলো।

বনহুর অস্ত্রখানা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। বিস্ময়কর অস্ত্র বটে, ঠিক যেন একটি বাঁশরী। এই অস্ত্রটি তাকে জীবন রক্ষা করতে সহায়তা করেছে।

বনহুর আর বিলম্ব না করে মুখোশধারীর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রগর্ভে। ঝপাং করে আরেকটা শব্দ হলো। তারপর নিশোসহ বাঁশরী অস্ত্র হাতে বেরিয়ে চললো। এগুচ্ছে বনহুর আর সবকিছু লক্ষ্য করছে, সব যেন বিস্ময়। জাহাজখানার প্রতিটা ক্যাবিনে নানা ধরনের মেশিন এবং যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বাইরে থেকে জাহাজখানাকে একটা মালবাহী জাহাজ মনে হয় কিন্তু ভিতরে তার রহস্য ভরা।

একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করে দেখলো চক্রাকারের একটা মেশিন। এটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে বনহুর পাশে কয়েকটা বোম বা সুইচ ছিলো তার একটা একটা করে টিপতে লাগলো।

একটা বোতাম টিপতেই পাশে লাল আলো জ্বলে উঠলো। অপর বোতামটা টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার মেশিনটা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করলো, ভেসে এলো একটা কণ্ঠস্বর... হঠাৎ অসময়ে কি সংবাদ মালিক।

বনহুর বুঝতে পারলো এটা ওয়্যারলেস মেশিন তবে সাধারণ নয়, একটু আশ্চর্য ধরনের।

বনহুর দ্রুত নিজের কণ্ঠকে মুখোশধারী ভাস্কর মাইথির কণ্ঠের মত করে নিয়ে বললো–আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি, এ মুহূর্তে আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। তোমরা জানো আমি দস্যু বনহুরকে খুঁজে পেয়েছিলাম কিন্তু সে আমার সঙ্গে বেঈমানি করেছে...

ওপাশ থেকে কণ্ঠ ভেসে আসে–বনহুরকে আপনি খুঁজে পেয়েছেন মালিক

হ। তোমরা এ সংবাদ জানো না বুঝি?

না, আমাদের জানানো হয়নি।

শোন সে সমস্ত মুক্তা নিয়ে পালিয়েছে...

মালিক–আপনি ভাববেন না, বনহুর যেখানেই যাক একদিন কান্দাই ফিরে আসবেই। আমরা সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে অতি গোপনে আত্মরক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বনহুর কান্দাই এলেই আমরা তাকে আটক করবো এবং সমুচিত শাস্তি দেবো।

....তোমাদের কাজ কতদূর অগ্রসর হলো?

....মালিক আপনি অসুস্থ তাই ঠিকভাবে সব স্মরণ করতে পারছেন না। আপনি তো সবই জানেন, দস্যু বনহুরের নাম করেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। মিঃ ভৌমকে হত্যা করে তার কন্যা মিস মতিবাঈকে আমরা হাইজ্যাক করে এনেছি। আমরা পঞ্চাশ লাখ টাকা দাবি করে একটা চিঠি দিয়েছিঃ...

খুব ভাল করেছো–যা আমার নির্দেশ সেভাবেই কাজ করছে। এখন মতিবাঈকে কোথায় আটক করে রেখেছো?

ওপাশ থেকে ভেসে আসে...সিন্ধি পর্বতের অভ্যন্তরে আমাদের আস্তানায়। মালিক, আপনি সব জানেন অথচ নতুন করে আবার জানতে চাইছেন তাই

....শোন, আমি এ মুহূর্তে বেশি অসুস্থ বোধ করছি। আমার বুকে এবং গলায় ব্যথা তাই তেমন করে কিছু স্মরণ রাখতে পারছি না এবং সুন্দরভাবে কিছু নির্দেশ দিতে পারছি না। আর কোনো নতুন সংবাদ আছে কি?

আছে মালিক, নতুন সংবাদ আছে–তা হচ্ছে পুলিশ এবং ডিটেকটিভের ঘোরাফেরা। তারা আমাদের সিন্ধি পর্বতের সন্ধান পেয়ে গেছে, তবে পথ খুঁজে পায়নি এবং পাবে বলেও ভরসা করি না।

হাঁ, আমিও তাই চাই, ওরা যেন কোনোদিন পথ আবিষ্কার করতে না পারে। আচ্ছা আবার পরে কথা হবে, তোমরা দস্যু বনহুর নামেই কাজ চালিয়ে যাও।

সুইচ টিপে অফ করে দেয় বনহুর মেশিনটা।

আপন মনেই বলে উঠলো বনহুর, মিস মতিবাঈয়ের মুক্তির দাবি জানিয়ে পঞ্চাশ লাখ টাকা আদায়ের জন্য মিঃ ভৌমকে ওরা হত্যা করেছে। যেমন করে হোক তাকে শীঘ্র কান্দাই পৌঁছতেই। হবে। মিঃ ভৌমের হত্যার প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে, উদ্ধার করতে হবে মিস মতিবাঈকে।

বনহুর যখন ওয়্যারলেসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তখন নিশো দাঁড়িয়ে ছিলো তার পাশে। চোখেমুখে তার বিরাট ব্যাকুলতা। এ জাহাজে তার আর এক দন্ড থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বারবার নিজের পিতার মুখখানা নজরে পড়ছে, ভাবছে সে নানা কথা।

কিন্তু বেচারী তার নিজের ভাষা দিয়ে বনহুরকে কিছু বোঝাতে পারছে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

*

বনহুর নিশোসহ জাহাজের চালকের পাশে এসে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেনও ছিলো ঐ স্থানে।

ক্যাপটেন এবং সারেং চমকে উঠলো।

বনহুরকে দেখে নয় তার হাতের মারাত্মক অস্ত্রখানা লক্ষ্য করে।

ভীতভাবে তাকালো তারা বনহুর আর নিশোর দিকে।

অবশ্য ইতিমধ্যেই তারা জানতে পেরেছে তাদের মালিক আর ইহজগতে নেই এবং সেই স্থান। দখল করে নিয়েছে তাদেরই আটককারী দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর নামটা এ জাহাজের সবার জানা হয়ে গিয়েছিলো তাই সবাই এ কথাও জানতে পেরেছিলো তাদের আটককৃত ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নয়। সাগরতল হতে যে মুক্তা আনতে সক্ষম হয়েছে সে যে কতখানি অসীম শক্তির অধিকারী তা তারা বেশ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ অক্টোপাশের সঙ্গে লড়াইটা জাহাজের সবাই তাদের টেলিভিশন ক্যামেরার লক্ষ্য করেছে।

সমুদ্রগর্ভে মুক্তা সংগ্রহ প্রচেষ্টা তাদের নতুন নয়। ইতিপূর্বে বহুবার বহু ডুবুরীকে সমুদ্রতলে মুক্তা সংগ্রহে পাঠানো হয়েছিলো কিন্তু কেউ ফিরে আসতে পারেনি। ভয়ংকর অক্টোপাশের কবলে সবাইকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

তাই বনহুর যখন জয়ী হলো তখন এ জাহাজের সবাই বুঝতে পারলো বনহুর অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং সে ঐ ভয়ংকর অক্টোপাশটার চেয়েও ভয়ংকর।

শুধু তাই নয়, বনহুরের হাতে সেই মারাত্মক অস্ত্রখানা রয়েছে যে অস্ত্রদ্বারা মালিক তার দলবলকে কুন্ডলি পাকিয়ে রেখেছিলো। ঐ অস্ত্র দ্বারাই সম্ভব হয়েছে সমুদ্রতল থেকে মুক্তা উদ্ধার করে আনা। ঐ অস্ত্র দ্বারাই সম্ভব হয়েছে ভয়ংকর অক্টোপাশটাকে হত্যা করা, যে অক্টোপাশ হাজার হাজার বছর ধরে আগলে রেখেছিলো মুক্তাগুলো।

জাহাজটার চালক এবং ক্যাপটেন ভয়বিহ্বল চোখে তাকালো বনহুর আর নিশোর দিকে।

ঐ মেয়েটাও যে কম নয় ওরা জানে।

মেয়েটা রড দিয়ে দুজন জোয়ান লোককে হত্যা করেছিলো– এটা কম নয়।

তাই ওদের ভয় হয় শুধু বনহুরকে দেখে নয়, নিশোর জন্যও। তবে ভয়ার্ত ভাবটা এসেছে নতুন করে কারণ তারা হারিয়েছে মালিক বা নেতাকে।

দলপতিকে হারিয়ে ওরা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। তাদের দলে যে ভীমকায় ব্যক্তিটা রয়েছে তার নিজস্ব বুদ্ধি বলতে কিছু নেই তবে সাংঘাতিক শক্তির অধিকারী সে।

পরিচালনার অভাবে সেও একেবারে পঙ্গু বনে গেছে। বনহুরের হাতে মারাত্মক অস্ত্রখানা দেখে সে যেন কোথায় আত্মগোপন করেছে। তাকে জাহাজ থেকে খুঁজে

বের করাই মুস্কিল।

এক সময় যার দ্বারা মুখোশধারী অসাধ্য সাধন করতে এখন সেই ভয়ংকর বীর কচি খোকা বনে গেছে।

ক্যাপটেন আর সারেং ঢোক গিলে তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর গম্ভীর কঠিন গলায় বললো–তোমরা জাহাজখানাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো সেই নাফা বন্দতরে। কোনো রকম চালাকি করতে চেষ্টা করলে এই অস্ত্র দ্বারা বা এই অস্ত্রের স্পর্শে তোমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেবো তোমাদের মালিকের কাছে, বুঝলে?

ওরা বনহুরের ভাষা বেশ বুঝলো, কারণ বনহুর ইংরেজিতে কথা বলছিলো তাদের সঙ্গে। বনহুরের কথায় এবং তার হাতের পরিচিত অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে ওরা সম্মতিসূচক মাথা দোলালো।

বনহুর নিশোসহ ক্যাপৃটেনের ক্যাবিনে ফিরে এলো। অবশ্য ক্যাপৃনেকেও সঙ্গে আনলো বনহুর।

এবং জাহাজখানাকে ঠিকভাবে চালনায় বাধ্য করলো।

*

পৌঁছতে বেশি বিলম্ব হলো না, দুদিন দুরাত অবিরাম চলার পর তাদের জাহাজখানা নাফা বন্দরে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করতেই বনহুর বন্দরস্থ পুলিশবাহিনীকে কৌশলে সংবাদটা পৌঁছে দিলো।

অবশ্য বনহুরের ছোট্ট চিঠিখানা নিশোই নিয়ে পৌঁছে দিলো বন্দরের পুলিশপ্রধানের হাতে।

বনহুর এ দুদিন দুরাত মোটেই ঘুমায়নি, সে সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে জাহাজের ক্যাপটেন চালক এবং অন্যান্য যে অনুচর ছিলো তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলো।

তার হাতের মারাত্মক অস্ত্রখানাই এই ভীষণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে দিলো।

সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সংবাদ জানামাত্র বিস্ময়কর জাহাজটাকে ঘেরাও করে আটকে ফেললো এবং বন্দী করে ফেললো জাহাজের দুষ্কৃতীদের। কিন্তু সেই বিশালদেহীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না।

বনহুর অবাক হয়ে গেলো, সেই বিশালদেহী গেলো কোথায়। তবে কি কোনো গোপন পথে সরে পড়েছে?

এই কদিনে বনহুর গোটা জাহাজটার সবগুলো জায়গা এবং সবকিছু রহস্যজনক মেশিন ও যন্ত্রপাতির খোঁজখবর সংগ্রহ করে নিয়েছিলো। সব জানা হয়ে গিয়েছিলো তার।

বনহুর পুলিশ বাহিনীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে দুস্কৃতিকারীদের সবাইকে আটক করে ফেললো। তারপর খোঁজা শুরু হলো বিশালদেহীর।

নাসফা বন্দরের পুলিশপ্রধান এবং বনহুর স্বয়ং গভীরভাবে অনুসন্ধান চালালো।

এক সময় বনহুর একটা ছিন্নভিন্ন ম্যাপসহ ছোট্ট ডায়রী উদ্ধার করলো। ঐ ডায়রীর মধ্যে জানতে পারলো সমুদ্রতলে যে মুক্তা সংরক্ষিত ছিলো তা অতি বিস্ময়কর। ঐ ডুবু পর্বতের সুড়ঙ্গে লক্ষ লক্ষ মুক্তাবাহী বা মুক্তাবাহনকারী ঝিনুকগুলোর যখন মৃত্যু ঘটতো তখন তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও মুক্তাগুলোর ক্ষয় হতো না বরং সমুদ্রের নোনা জলে মুক্তাগুলোর উজ্জ্বলতা বাড়তো। এ ম্যাপটাও ছিলো ঐ দুর পর্বতের।

বনহুর পুলিশপ্রধানকে সব বুঝিয়ে বললো। যদিও আমরা বেশ বুঝতে পারছি সমুদ্রতলে আরও বহু মুক্তা স্তূপাকার হয়ে রয়েছে কিন্তু উদ্ধারের কোনো উপায় নেই।

বনহুর মুক্তার থলেটাও প্রদান করলো নাসফা সরকারের নিকটে।

নাসফা সরকার বনহুরকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতে চাইলে তা সে গ্রহণ করলো না, কারণ কোনো লোভ লালসা মোহ তার ছিলো না, আর ছিলো না বলেই বনহুর মুক্তাগুলো বিনাদ্বিধায় তুলে দিলো নাফা সরকারের হাতে।

নাসফা সরকার এত খুশি হলো যে আটককৃত জাহাজখানা দান করলো বনহুরকে।

বনহুর এ জাহাজ সানন্দে গ্রহণ করলো।

*

নিশোকে তার বাবার হাতে তুলে বললো বনহুর– তোমার কন্যা আমার জীবনে মুক্তি এনে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। তার জন্য আমি তোমাকে কি দেবো ভেবে পাচ্ছি না তবে আমার এই আংটিটা তোমাকে দিলাম।

বনহুর জানে নিশোর বাবা তার কথার একটা বর্ণও বুঝতে পারছে না, তবুও সে বললো, তারপর নিজের হীরার আংটিটা খুলে নিশোর পিতার হাতে পরিয়ে দিলো।

নিশোর পিতার চোখে আনন্দ–অশ্রু ঝরতে লাগলো। এত খুশি সে কোনোদিন হয়নি। কন্যাকে হারিয়ে সে পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলো।

পথে পথে অলিতে গলিতে সে সব সময় নিশোর সন্ধান করে ফিরতো। সঙ্গী সাথী এবং ষ্টিমার সব তার ছিলো, শুধু ছিলো না তার নয়নমনি জীবনধন কন্যা নিশো।

নিশোকে পেয়ে হারানো মানিক যেন খুঁজে পেলো সে, বুকে চেপে ধরলো আনন্দের আতিশয্যে।

বনহুর বিদায় নিলো।

নাসফা সরকার তাকে কয়েকজন দক্ষ সারেং এবং একজন ক্যাপটেন দিলেন, যারা জাহাজখানা কান্দাই বন্দরে পৌঁছে দেবে।

নিশোর দুচোখে পানি।

সে করুণ ব্যথা ভরা হৃদয় নিয়ে বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বেচারী কিছু বলতেও পারছে না, সে জানে বনহুর তাদের কথা বোঝে না বা বুঝতে পারে না।

এক সময় বনহুর জাহাজে এসে দাঁড়ালো।

ভাবছে, বনহুর এ জাহাজখানা তারই ভাগ্যে এসে যাবে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কতকটা না চাইতেই যেন সুধার পাত্র।

নিশো হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

আর হয়তো কোনোদিন দেখা হবে না।

পাশে দাঁড়িয়ে নিশোর পিতা এবং তার দলবল।

তারাও হাত নাড়ছে।

নিশোর চোখে পানি।

গন্ড বেয়ে পানি হয়তো গড়িয়ে পড়ছে, বনহুর দেখতে পাচ্ছে না যদিও কিন্তু উপলব্ধি করছে।

বনহুরের মনেও ভীষণ একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠছে কিন্তু কোনো কিছু করবার নেই, তাকে স্বদেশে ফিরে যেতেই হবে।

নিজের দেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নিশোর পিতার দলটির অদূরে দাঁড়িয়ে নাসফা পুলিশপ্রধান ও পুলিশবাহিনী।

তারাও বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে হাত নেড়ে, কেউ বা রুমাল উড়িয়ে।

বনহুর নিজকে বড় একা মনে করছে।

এ মুহূর্তে কেউ তার পাশে নেই।

সে নিজের দেশে ফিরে চলেছে একা বড় একা। নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হচ্ছে, বড় কান্না পাচ্ছে বনহুরের, সত্যি কি সেও তবে নিশোকে ভালবেসেছিলো।

জাহাজটা অনেক দূরে চলে এসেছে।

নিশোর মুখখানা আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

পুলিশবাহিনী সবাই ফিরে যাচ্ছেন।

নিশো ও নিশোর বাবা এখনও দাঁড়িয়ে আছে বন্দরটার কূল ঘেঁসে।

সব অস্পষ্ট হয়ে এলো।

বনহুর তবু ভাল করে লক্ষ্য করছে। বড় ইচ্ছা হচ্ছে আর একবার যদি সে নিশোকে দেখতে পেতো....

হঠাৎ পেছনে কেউ ডাকলো–স্যার

একজন সারেং তাকে ডাকছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি হাতের পিঠে চোখ মুছে নিয়ে বললো বলো?

স্যার, আসুন আমার সঙ্গে।

বনহুর সারেংটার সঙ্গে এগুলো।

ইঞ্জিন ক্যাবিনের সম্মুখে আসতেই একটা উৎকট গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো তার।

ইঞ্জিন ক্যাবিনটার মধ্যে বনহুর অন্যান্য সারেং এবং ক্যাপটেনকেও দেখলো।

তাদের সবার চোখেমুখে একটা কেমন যেন উৎকণ্ঠা ভাব ছড়িয়ে আছে।

বনহুর নিকটে আসতেই ক্যাপটেন অংগুলি দিয়ে বয়লার দেখিয়ে বললো–স্যার, ঐ দেখুন...

এগিয়ে গেলো বনহুর।

সবাই তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

অনেকেই নাক চেপে ধরে আছে।

বনহুর দেখলো বয়লারের মধ্যে কুন্ডলি পাকিয়ে আছে একটা মাংসপিন্ড।

সে অবাক হলো।

সবার চোখেই বিস্ময়।

ক্যাপটেন বললো–ওটা কোনো মানুষ বয়লারের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো মনে হচ্ছে।

বনহুর ওটাকে বের করার জন্য নির্দেশ দিলো।

নাকে কাপড় বেঁধে বস্তুটাকে টেনে বের করে আনলো দুজন সারেং।

বনহুর দেখলো সেই বিশালদেহী ভীমকায় লোকটা। যাকে বহু সন্ধান করেও পুলিশবাহিনী এবং বনহুর খুঁজে পায়নি।

বিশালদেহী লোকটা বয়লারের মধ্যে আত্মগোপন করে বাঁচতে চেয়েছিলো। কিন্তু যমদূত তাকে রেহাই দেয়নি।

বনহুর অর্ধদদ্ধ বিশালদেহের মৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ভাবছে সে, এই তো মানুষের কর্মফল। অসীম শক্তির অধিকারী হয়েও সে নিজকে রক্ষা করতে পারলো না। আশ্রয়স্থল ভেবে যেখানে সে আত্মগোপন করেছিলো সেই আশ্রয়স্থলই হয়েছে তার কাল।

বনহুর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, সে ভুলে গিয়েছিলো এটা তার আস্তানা নয়।

ক্যাপটেন ও সারেংগণ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে উঠলো–একটা জীবনের পরিসমাপ্তি

[পরবর্তী বই নূপুরের ঝংকার]